একটি রঙিন দুপুরের অপেক্ষা

একটি রঙিন দুপুরের অপেক্ষা

ফজলুর রহমান

KOBI PROKASHANI

একটি রঙিন দুপুরের অপেক্ষা
ফজলুর রহমান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Akti Rangin Dupurer Opekkhya by Fazlur Rahaman Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-9-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার লেখালেখির বয়স আর তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের বয়স প্রায় সমান। সে আমার লেখালেখির খোঁজ-খবর রাখে ও অনুপ্রেরণা দেয়। সেই বন্ধুবরেষু

দিবা আফরোজ-কে

সূচিপত্র

কক্ষপথ পরিভ্রমণ শেষে ৯
আমাদের দেখা হবে না ১০
লক্ষ যোজন দূরে ১১
আপনা মাংসে হরিণা বৈরী ১২
অবেলায় অবসরে ১৩
চিঠি : ০১ ১৪
কাঠগোলাপের পঙ্‌ক্তিমালা ১৫
ভুলে গিয়ে মনে রাখা ১৬
তোমাকে আর পাওয়া হয় না ১৭
ছল ১৮
মৃত ইলিশের ঘুম ১৯
কুহক ২০
বৃষ্টি ও কিছু নস্টালজিয়ার গল্প ২১
রাজহাঁসের গল্প ও একটি নিরীক্ষাতত্ত্ব ২২
পুতুলনামা ২৩
আমি যা কিছু ভালোবেসেছি : ০১ ২৪
আমি যা কিছু ভালোবেসেছি : ০২ ২৬
শঙ্খজীবন ২৮
উদাত্ত আহ্বান ২৯
রূপকথা ও নির্জনতার গল্প ৩০
দাম দিয়ে কেনা নয় ৩১
খুশবু ৩২
এ শহরে ডুবে যায় আলো ৩৩
স্মৃতিঘর ৩৪
তুমি, অনুভূতি ও উপমার নাম ৩৫
অন্তর্যামী জানে ৩৬
একদিন ৩৭
নাজুক বিকেলের গল্প ৩৮
নিঃশব্দে নির্মাণ ৩৯
আমাদের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি নেই ৪০
বাদামি আলোয়ানের কাব্য ৪১
ভেজা ডুমুরের দিন ৪৩
ধানতাবিজের বৃষ্টি ৪৪
নোনাজীবন ৪৫
তোমার নাম ধরে ডেকে যায় ৪৬
প্রজাপতি এলেই ৪৭
তুমি ও একটি শালিকজীবন ৪৮
একটি রঙিন দুপুরের অপেক্ষা ৪৯
প্রস্থান ৫০
চিঠি : ০২ ৫১
তোমাকে জানতে চেয়ে ৫২
প্রাপ্তি স্বীকার ৫৩
তবুও সে ভালো থাকুক ৫৪
ইচ্ছে ৫৬
এই শহরকে দেখা ৫৭
অবসাদ ৫৮
ভালোবাসা বেচার বিজ্ঞাপন ৫৯
একটা বৃষ্টিদিনের জন্য ৬০
বিভ্রান্তির পঙ্‌ক্তিমালা ৬১
হলুদ পাতা ঝরার পর ৬২
আশার পদধ্বনি শুনি ৬৩
ভুল বোঝার আগেই... ৬৪
জিতে যাব একদিন ৬৫
বিন্দুতে রেখায়িত সিন্ধুর দ্যোতনা তুমি ৬৬
জলগদ্য : ০১ ৬৭
জলগদ্য : ০২ ৬৮
নির্মাণের নেপথ্যের অনুভব ৬৯
বাদামি বার্তা ৭০
ফেরার কথা ছিল ৭১
প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০১ ৭২
প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০২ ৭৩
প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০৩ ৭৪
প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০৪ ৭৫
আষাঢ়ের কসম ৭৬
ভালোবাসার কড়চা ৭৭
ব্যবচ্ছেদ ৭৮

আমার বিশেষ কোনো দুঃখ নেই ৭৯
অন্য জনমে ৮১
লুটেরা ৮২
ওয়াদা করিনি তো... ৮৩
মানব কড়চা ৮৪
রংতুলির কাব্য ৮৫
তোমার মন কথার নবপাঠ ৮৬
সাদামাটা বৃষ্টির দিন ৮৭
পরাণকথা ৮৮
তুমি ও নয় হাজার পাঁচশ সাতান্ন শব্দ ৮৯
কবিতা, তোমার জন্য ৯০
সহজ বুনন ৯১
মধুরিমা ও একটি জীবনের গল্প ৯৩
মধুরিমা ও হেমন্তের পঙ্‌ক্তিমালা ৯৪
মধুরিমা ও একটি অপূর্ণ প্রেম ৯৫
মধুরিমা, বহতা সময়ের স্বর ৯৬
মধুরিমা ও একটি অপ্রকাশিত ছেলেবেলা ৯৭
আমি যে মধুরিমাকে চিনি ৯৮
চেনা-অচেনার মুখোচ্ছবি ৯৯
এ শহর একদিন ১০০
কবিতা বিরহের অন্য নাম ১০২
বীজমন্ত্র ১০৩
মেঘ ও বৃষ্টির আলাপন ১০৬
শব্দচিত্র : ০১ ১০৮
শব্দচিত্র : ০২ ১০৯
কষ্ট করে মনে রেখো না ১১০
বেনেবউ ১১২
উলটো পথে ১১৩
রুমালি মন ১১৪
অনাবিষ্কৃত সভ্যতার আদিপাঠ ১১৫
স্পর্শাতীত অনুভূতির কাব্য ১১৬
বেনামি চিঠি ১১৭
প্রেমিক হয়ে ওঠার গল্প ১১৮
ধানি রোদের দিন ১১৯
তোমাকে ছেড়ে দিলেই যদি ১২০
অভিযোগ ১২১
হাওয়া এসে বলে যায় ১২৩
১২৪ বিপরীত
১২৫ মেঘলা মানবীর কাব্য
১২৬ ভালোবাসি, একবার বলে দেখো
১২৭ জলজীবনের ছবি
১২৮ মাধুকরী
১২৯ সবিনয় নিবেদন
১৩০ বৃষ্টিতে ভেজার দিন
১৩১ বেঁচে থাকুক আমাদের ভালোবাসা
১৩২ মিছেই খুঁজে ফেরা
১৩৩ হরিণচোখ
১৩৪ শোক
১৩৫ কাঠগোলাপের কিছু কথা
১৩৬ সন্ধ্যানামা
১৩৭ জীবন তরঙ্গ
১৩৮ প্রমাণিত ভালোবাসা
১৩৯ অজানা গল্পের না পড়া পৃষ্ঠা
১৪০ অনুরণন
১৪১ জল ও নারীর কাব্য
১৪২ তোমাকে ভালোবাসি বলেই
১৪৩ ঝিনুক ও নাবিকজীবন
১৪৪ আবাহন
১৪৫ আমি মন্দ যদি
১৪৬ রহস্যপাঠ
১৪৭ প্রেমের মোহর
১৪৮ জলরঙে জীবনের আঁক
১৪৯ টিপ
১৫০ তোমার প্রস্থান
১৫১ দ্বিধা
১৫২ তুমি বলেছিলে বলেই
১৫৩ জলে বন্দি প্রেম
১৫৪ পুরুষ পতঙ্গ
১৫৫ তারপরে তুমি যেয়ো
১৫৬ গাছমানুষের কাব্য
১৫৭ নাগরিক মন
১৫৮ বিন্দু থেকে বৃত্তে
১৫৯ তোমাকে না দেখার অসুখ
১৬০ সোমেশ্বরী জানে না

কক্ষপথ পরিভ্রমণ শেষে

পৃথিবীর কক্ষপথ পরিভ্রমণ শেষে আমিও কি ক্লান্ত নই? তোমার চোখের ভেতর পানাম নগরের যে লুপ্ত ইতিহাস সারসের ডানার পালকের মতো খসে পড়ে; ছাতিম ফুলের গন্ধে তা পুকুরের জলে ভেসে রয়। বিধবার বুকের ভেতর নির্জন দুপুর ডাকাতিয়া নদীর মতো কেন ঢেউ তোলে? কোনো কোনো দিন টিকটিকির ডিমের মতো শাদা—ভাঙা অর্থহীন পড়ে থাকে ক্যালেন্ডারের পাতায়। জাদুর শহর থেকে তুমি আতরের শিশি ভরে যে সুগন্ধ আলো এনেছ বলে দাবি করেছ তা হাজার বছরের জমাট অন্ধকারকে ম্লান করেনি। কুয়াশার চুল নাকি চুলের কুয়াশার ভেতর তুমি হারিয়েছ নাকফুল? যে নগরবাসী মনে করে গির্জার চূড়া স্রষ্টাকে স্পর্শ করে—সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়—সে নগরবাসী থেকে দূরে আরও দূরে সিমেট্রির গাঢ় অন্ধকারে স্রষ্টা কি আরও কাছে নন? বৃষ্টিতে ভেজা কিংবা না ভেজা তোমার চোখে ঠিকই জলপাই পাতার রোদ খেলা করে। যদি করবী ও একটি খোঁপার জন্য ব্যয় হতো একটা জীবন তবে স্রষ্টার কাছে কি চাওয়া যেত না আর একটা প্রত্ন যুগ কিংবা যুগান্তর অথবা হাজারো সৌর শতাব্দী? কলঙ্ক চাঁদে থাকে না—কাজলে থাকে না—কালো জলে থাকে না তবুও সে জলেই কেন ডোবে সেই সুন্দর মুখ!

আমাদের দেখা হবে না

এইসব শীতের দিন এসে এসে চলে যাবে,
তবুও আমাদের দেখা হবে না;
একলা শালিক কেঁদে কেঁদে অঘ্রাণের ধান মুখে নিয়ে ফিরে যাবে,
যে কুয়াশা শাদা শাড়ি হয়ে উড়ছে পৌষের হিমেল বাতাসে সন্ধ্যায় সেও চলে যাবে মেঘের বাড়ি।
মরা ব্রহ্মপুত্র যেটুকু জল বুকে আগলে রেখেছে তেমন করে আর তোমাকে আগলে রাখা হবে না।
জ্যোৎস্না দিন আসবে আবার,
চাঁদের আলোয় ভাসবে বহ্মপুত্রের চর;
কুয়াশার শরীর ঘেমে টিপটিপ করে ঝরবে শিশির।
তবুও আমাদের কথা হবে না।
একটা মেঠো পথ অনেক লোকের খবর নেবে সারাদিনভর;
একটা পুকুরঘাটে দুপুরবেলা অনেক গল্প গুঞ্জরিত হবে কানে কানে;
একটা উঠোনজুড়ে অনেকগুলো বাহারি খোঁপায় হরেক রকমের ফুল গুঁজে দেওয়া হবে,
রসুইঘরে পেস্তা বাদাম, কিশমিশ, আলুবোখারার ঘ্রাণে একটা নাম ঘুরে-ফিরে আসবে বারবার;
তবুও আমরা থেকে যাব দূরে।
এই লোকালয়, জনাকীর্ণ পথ, ধুলোর শহর, রুগ্‌ণ রোদ সবকিছু থাকবে;
টিমটিমে আশা, হিসেবের খাতা, মাস খরচের মাইনে থাকবে,
আর বারান্দায় বেড়ে ওঠা সূর্যমুখীও ফুটবে।
কেবল তোমার আমার চার চোখ আর এক হবে না।
মরা ব্রহ্মপুত্রে জল এলেও আর আমাদের কখনো ভাসা হবে না।
এই শীত চলে গেলেও, একলা ডাহুক ডেকে গেলেও আমাদের আর দেখা হবে না।

লক্ষ যোজন দূরে

নির্জনে তোমাকে পাব এমন বিশ্বাসেই কোলাহলে তোমাকে খুঁজি না আর। জলের ভেতর আলোর রেখা মিলিয়ে যাওয়ার আগে মীন সন্তানদের কানকোয় যে চঞ্চলতা ফুটে ওঠে তেমন আকুলতা কি তুমি আমার মাঝে দেখো না? আঁশটে ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ার আগে শিকারি কীভাবে বুঝে ফেলে মীনের গতি! এই যে বৈধব্য বেশ, আমিষ ছেড়ে দিয়ে নিরামিষে আসক্ত—এই উপবাস কিংবা যৌবনকে কাচের বয়ামে পুরে তোমার পায়ে বর্তে দেওয়া—এসবের বিনিময়ে বেহেশতে কী প্রগাঢ় প্রেম, চির তরুণ জীবন দেবে না আমায়? একটা তন্দ্রা টুটে যাওয়া ভোর, পুবাকাশে ঘোড়ার খুরের ছায়ার মতো মেঘ, সারা রাত জেগে থাকা বেশ্যার ঘুঙুর ও তার করুণ মুখে, শরাবে নিমজ্জিত গালিবের চোখে তুমি কি দেখা দাও না? ভাসো না মেঘের শায়রে? ফেনায়িত ঢেউয়ে? তোমাকে কি পাওয়া যায় না ঝিনুকের শব্দে, বায়োস্কোপের—'কী চমৎকার দেখা গেল' ছবিতে? ম্লান সাঁঝের আজানে, মন্দিরের ঘণ্টায়, গির্জার সুউচ্চ মিনারে? তোমাকে পাব বলেই মোমবাতি হই। পুড়ে পুড়ে শেষ হই তবুও লালনের মতো 'লক্ষ যোজন দূরত্ব' ঘোচে না।

আপনা মাংসে হরিণা বৈরী

বেগানা দুপুর ঘরে ঢুকবে বলে সূর্যকে পাশ কাটিয়ে যে তুমি বার বারান্দার ছায়ায়
এসে গুটিসুটি মেরে দাঁড়াও;
সেই তোমাকে কাকচোখে আড়াআড়ি দেখে নিই আমি।
বাইরে টং দোকানে তখন মার্কিনি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ চলছে সিগারেটের ধোঁয়ায়;
গাধা কেমন করে হাতিকে হারায় জনতার চোখে-মুখে সেই বিস্ময়!
হঠাৎই শীত নেমে পড়া কার্তিকের বিকেলে তোমার চোখে কুয়াশার লজ্জা,
তুমি ভাবতে থাকো শ্যাওলা পুকুর জলে ছাতিমের ছায়া ফুলন্তনভারে কেমন করে
যুবতীর মতো নড়ে?
সেফটিপিনে শাড়ির আঁচল আটকাতে গিয়ে আটকে ফেলো আমার মন।
এভাবে রাজনীতি, রাজপথ, রাজদ্রোহ অগ্রহায়ণ আসার আগেই কুয়াশায় আটকে যায়;
যে চাঁদকে এত রূপালি বিভায় বিত্তশালী দেখায় তা তো জ্যোৎস্নার আলোর ভেলকি।
জাদুবাস্তবতায় তোমার খোঁপা বিষধর সাপ হয়ে যায়,
আশ্বিনে নামে তুমুল বৃষ্টি আর পৌষে খররোদ।
তবুও কুয়াশার সকালে এক টুকরো মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করে কতকগুলো বুনো কাক;
তুমি তখন বুঝে যাও, 'কেন আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।'

অবেলায় অবসরে

এইসব বেদনা নিঙড়ানো বিকেল, যা সূর্যের মতো লালিম হয়ে ঘন হয়; তাতে গরম জলের ভাপের মতো উষ্ণ হয়ে ওঠে জীবনের উঠোন। মাথার ভেতর থরে থরে মেঘ জমতে থাকে, চেতনা কেমন যেন একটা অ্যানেস্থেশিয়ায় আচ্ছন্ন হয়। বুনো ঝোপের গা বেয়ে গলিয়ে পড়া রোদ্দুর ইলিশের শরীর মেখে নেয়। নদীর পেটে রাখা দুঃখ গাঙচিল ঠোঁটে করে পড়ন্তবেলায় আকাশের কাছে নিয়ে আসে। এইভাবে মোষের চোখের মতো লাল মেঘ চিকন সন্ধ্যাকে তাড়িয়ে আনে ঘরে; ডাহুকের গায়ের মতো কালো চুল নিবিড় আঁধার নামিয়ে আনে। হাটবারে গোয়ালা ফেরে দুধের ভাঁড় নিয়ে, তখন নদীর ঢেউয়ে শ্যাওলার ঘ্রাণ পাওয়া যায় পশ্চিমা বাতাসে। টিনের চালের ঢালে, তার চকচকে গায়ে লেগে থাকা শেষ বিকেলের রোদটুকু চুষে নেয় চকিত চড়ুই। চারদিকে মৃত্যুর মতো নামে শ্মশানের ভেজা শূন্য স্তব্ধতা; অশ্রুর ফোঁটায় ফোঁটায় শুকিয়ে ওঠে সমুদ্রের লবণ। এই দুধের শরের মতো ঘন হওয়া জীবন, যা মৌচাক হয়ে তুলে রাখে মৌমাছির গল্প; তাকে অনাদি অনন্ত করে তোলে হৃদয়ের সিন্দুকে লুকোনো আমাদের প্রেম। কতবার যে কথা বোবা হয়ে ফিরে গেছে; শীতের জলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে ঠোঁটে গেড়েছে আবাস; লেপের তুলোর উম নিয়ে সে কথা আজ ফুটেছে আমের বোল হয়ে। এমন সব বয়ে বেড়ানো বিষণ্ন দিন, যা শার্টের কলারে কাত হয়ে ভাঁজ পড়ে থাকে ; তাকে তারে ঝুলিয়ে দিয়ে অবছায়া বিকেল সবটুকু রোদ শুষে নেয়।

চিঠি : ০১

নিয়ন আলোর সন্ধে যখন খোঁপায় করে এনে বললে,
'তোমার চিঠিগুলো কি আমার মন পড়তে জানে?'
শরৎ বিকেলের আলো কমে আসা নীলাভ মেঘের দিকে চেয়ে বলেছিলাম,
'আমার কলম জলে ভাসানো চোখ,
তর্জনীর তিল আর শ্যাওলা পড়া মনও অন্ধের মতো পড়তে পারে।'
তুমি অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে বলেছিলে,
'তুমি একটা ডাকাত,
আতকা এসে লুট করো সব; কপালের টিপটাও বাদ পড়ে না।
তোমাকে যে কথা লিখব ভেবে ভেবে সারা দিন মনস্থির করে রাখি;
সে কথা পরের চিঠিতে কীভাবে জাদুকরের মতো লিখে পাঠাও আমাকে?
কেমন করে খোলো তুমি মনের দরজা?'
মেঘের পাহাড়, আধোয়া জ্যোৎস্না আর একটা আস্ত চাঁদ হলুদ খামে পুরে আমি চাইলেই তোমাকে দিতে পারি।
তুমি বললেই তোমার চোখে নিমেষেই এঁকে দিতে পারি মোগল কারুকাজ।
একটা চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে পারি এক জনম;
অথবা ঊনসত্তর বছর, ছয় মাস, তেরো দিন, নয় সেকেন্ড।
তোমার খোঁপায় জড়ানো নিয়ন সন্ধ্যা জানুক,
একটা নদী চিঠিতে পাঠাব বলে,
কবে থেকে আমি তার জলদাস হয়েছি জানো?
একটা ভুবন চিল হব বলে কতটা আমি উড়তে শিখেছি জানো?
তুমি বলেছিলে,
'এত কথা আমি লুকিয়ে রাখি কোথায়?
চিঠির কালো অক্ষরে অক্ষরে বুঝি;
মন ভোলাবার মন্ত্র তুমি জানো।'
একটা কথা সত্যি তোমাকে বলি,
'তোমার চিঠি তোমারও অধিক জানি,
নাকফুলে কি আটকে রাখো চিঠির প্রশ্নগুলো?
চাঁদনি রাতের দোহাই,
শনশনে বাতাসে এর উত্তর তুমি দিয়ো।'

কাঠগোলাপের পঙ্‌ক্তিমালা

আশ্বিনের মেঘ জানত তুমি আসবে,
রোদে রোদে কী ভীষণ কানাঘুষা;
জলা-জঙ্গলের রুক্ষ ভাব উবে গিয়ে সেখানে পরিপাটি বাতাসের গীতল আসা-যাওয়া।
তুমি আসবে,
কাঠগোলাপ জানত কি তা; জানত কি তোমার মেঘকালো খোঁপা?
দর্জিবাড়ির উঠোন, সেখানে নুইয়ে পড়া মাধবীলতার গুচ্ছরা জেলেকন্যা মালতীর মতো অপেক্ষা করে আজকাল।
খেয়াঘাটের নৌকা; নদীপারের বাড়ন্ত কাশবনের সাথে পত্রালাপের মতো কথা কয়।
ডুমুরডোবা হাওড়ের জলের ঢেউ,
তার সাথে ভেসে আসা নকশি রুমাল তোমার মুখোচ্ছবি ভাসিয়ে আনত।
হেলে পড়া সূর্য যখন লাল শাড়ি পরা রাঙা বউ;
তখন তুমি কি এসেছিলে নরসুন্দার ঘাটে?
কাঠগোলাপ জানত কি তা; জানত কি তোমার মেঘকালো খোঁপা?
পিটপিট জ্যোৎস্না আর আলসেমি চাঁদ কি জানত তোমার কথা?
শাপলার মতো মুখ যা নীলাভ আকাশকে মনে করিয়ে দেয় দূর দেশের ঠিকানা;
অমাবস্যার নদী, ঝিনুকের শঙ্খ জানত তুমি আসবে।
কাঠগোলাপ জানত কি তা; জানত কি তোমার মেঘকালো খোঁপা?
পিতলের থালায় দেখা মুখ,
ঘোড়াউত্তরা নদীতে ভাসা আঁচল যে জলছাপ বুনে দিত মনে,
সে মন জানত রেলগাড়ি চেপে আসবে কেউ নরহরি কবিরাজের ভিটিতে।
ঝুঁকে পড়া চাঁপা ফুলের মতো তার দেহের গড়ন।
কাঠগোলাপ জানত কি তা; জানত কি তোমার মেঘকালো খোঁপা?

ভুলে গিয়ে মনে রাখা

আয়োজন করে দুঃখ দিয়েছ বলে তা মনে রাখার জন্য ক্যালেন্ডারের তারিখ মুখস্থ করতে হয় না আমার। আমি তোমাকে না পেয়ে যেভাবে তোমাকে মনে রেখেছি পেলে তোমাকে মুখস্থ করা হতো হয়তো মনে রাখা হতো না। মূলত মানুষ ব্যবহারে ক্ষয় হয় স্মৃতিতে তোলা থাকে ফুলতোলা রুমালের মতো। পরিপাটি, সুগন্ধি চেতনার মতো। তোমার ভাবনা তিরিশ বছর আগে বাদ দিয়ে দেখেছি আমি আসলে তিরিশ বছর ধরে কর্মে যতটা মনোযোগী হয়েছি 'তোমাকে আর কখনো ভাবব না'—এই চিন্তায় তার চেয়ে ঢের বেশি মনোযোগী ছিলাম। বিগত তিরিশ বছরে আমার ওষুধের কৌটা, মাথাব্যথার বাম, চশমার বক্স, ছাতা, জলের গ্লাস, কলম, সঞ্চয়িতা, পাঞ্জাবি-পায়জামা বা হাতঘড়ি কোথায় রাখি এসব ভুলে গিয়ে পনেরো অক্টোবর উনিশশ নব্বইয়ে সাভার বিরুলিয়া গ্রামের গোলাপ বাগানের নির্জন সন্ধ্যা, তার পরের বছর বিজয়া দশমীর দিন লোকাল বাসে চেপে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দুর্গা মাকে দেখতে যাওয়া কিংবা যে বছর অনেক বর্ষা হলো সে বছর মাধবপুর মেলা শেষে দুজনে বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে নাগরদোলায় উঠে দোল খাওয়া—কীভাবে এসব আমার মস্তিষ্কের নিউরনের পরতে পরতে এত সজীব! তবে কি তোমাকে ভুলতে চেয়ে তোমাকে অবচেতনে মনে রাখার চর্চা করেছি নিত্য? তুমি আয়োজন করে দুঃখ দিয়েছ কিন্তু আমি তা গোপন করে যাপন করেছি। তুমি বলেছিলে,

'আমাকে পেলে তুমি সুখী হবে,
না পেলে তুমি অমর হবে।'—কোনটা চাও?

আমি অমরত্ব চেয়েছিলাম। তুমি এসে দেখে যাও তোমাকে যে পেয়েছে তার চেয়ে তোমাকে না পেয়ে কতটা ঢের বেশি পেয়েছি তোমায়।

তোমাকে আর পাওয়া হয় না

ভালোবাসা পাব না বলেই কি আমি এতটা নিখুঁত পরিপাটি প্রেমিক? কতটা শূন্যে মেঘ ওড়াই? কিংবা কতটা ঢেউ গুনে গুনে হই সোমেশ্বরী নদী? রাত জেগে জেগে যে তারারা তোমার হাঁসুলি, ধানতাবিজ, নাকের বেশর, নোলক, কানের ঝুমকো, চোখের কাজল, সিঁথির টিকলি, কোমরের বিছে, পায়ের নূপুর, আলতা দেখল তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা শেষ রাতে ক্লান্ত হয়েছিল কি না? উত্তরে তারারা বলেছিল, রাত না ফুরালে চাঁদটাকে তোমার কপালে টিপের মতো পরিয়ে দিত। অথচ আমি তোমাতে কতটা মগ্ন তবুও তুমি অপাঠ্য রয়ে যাও 'রাত ভরে বৃষ্টি'র মতো।
স্টেথিস্কোপের মতো তোমার হার্টবিট বুঝে, তোমাকে অ্যানাটমির মতো মুখস্থ করে কিংবা কালো মেঘ দিয়ে কালো বেণী বানিয়ে কী এমন ভালোবাসার বৃষ্টি নামাতে পেরেছি তোমার চিলেকোঠার ছাদজুড়ে? এই যে নিশাচর পাখি যে ডানা ঝাপটায় তোমার মনের চারধারে কিংবা যারা সরাইখানা বন্ধ বলে ফিরে এসেছে নীল জল তোলা নদীতে; যারা দেহ ভাসিয়েছে ফেনায়িত ঢেউয়ে তাদের ভালোবাসার গল্প তারা ঝিনুকের পেটে জমা রেখে গেছে। আমি ভালোবাসা ফেরি করি বলে ফুলতোলা রুমালে তুমি পাঠাও না চিঠি। লেখো না তোমার মনের কথা। তাই ফুলতোলা রুমাল, চিলেকোঠার বৃষ্টি, আলতার শিশি, তোমার গায়ের ঘ্রাণ আর একজোড়া চোখ পেলে তোমাকে আর পাওয়া হয় না।

ছল

এই যে ভালোবাসবা না বলে বলে আমাকে ভালোবাসো,
কাছে আসবা না বলে বলে কাছে আসো।
এই ছল আমার ভালো লাগে।
এই যে পায়ে ব্যথা বলে বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটো,
অথচ দ্বিধা নিয়ে আমার হাত ধরো না;
এই স্পর্শহীনতা তোমার প্রতি আমার মনোযোগ বাড়ায়।
মনে করবা না ভেবে ভেবে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকো,
বারবার হাত ঘড়িটার দিকে তাকাও আমার আসবার সময় পেরিয়ে গেল কি না তা
দেখার জন্য—এমন উৎকণ্ঠা আমায় বিচলিত করে।
আমাকে খুঁজবা না ভেবে ভেবে তোমার যে চোখ ড্রইংরুমে আমাকে দেখে
আশঙ্কামুক্ত হয় সে চোখ আমাকে ভাবায়।
এই যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকো,
নিজেকে দেখা ভুলে গিয়ে আমাকে ভাবো।
এই যে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে নিজে চা খাবে ভেবে ভুলে দুই কাপ চা করো—
এই ছল আমি বুঝে ফেলি।
ছাদে মেলে দেওয়া আমার শার্টে নাক ডুবিয়ে গন্ধ খোঁজো;
অথচ বৃষ্টি আসতে পারে ভেবে তা আড় থেকে তুলে রেখেছ এমন কারণ দেখাও,
সেই বাহানা আমি ধরে ফেলি।
পড়বে বলে লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে থাকো,
অথচ কী বই পড়বে জানতে চাইলে বলো—হুমায়ূন আহমেদের 'দেবদাস';
আমি বুঝে নিই তুমি আমাকে খুঁজতে এখানে আসো।
যা বলবা না বলে ভেবে রাখো,
যা লিখবা না বলে কলম হাতে নাও বারবার
আমি সেই না বলা কথা আর না লেখা ভাষায় মুগ্ধ হই।

মৃত ইলিশের ঘুম

মদের সাথে ঢোক ঢোক শব্দে গিলেছি রাত,
দেখেছি রাতের বস্তি কীভাবে নিয়ন আলোয় বেশ্যা হয়ে ওঠে।
স্টেশনে, ফুটপাতে, মন্দিরে, গির্জায় দলাপাকানো মানুষগুলো আলোভুক পোকা হয়ে যায়;
ভোরের রেখা ফুটে উঠলে,
প্রাতঃকৃত্য সেরে তার পাশে মৃতের মতো শুয়ে থাকে তারা।
বিষ্ঠালোভী মাছি নাকের ওপর ভনভন শব্দে উড়ে বেড়ায়,
শুয়োরের ঘোঁত ঘোঁত শব্দে জাগে কাম;
লালসার কাঁটা নড়ে,
একবার যে বিবেক কিনে নেয় জুয়াড়ি;
তাসের মতো তা ঘোরে অন্যের হাতে হাতে।
চোখ খুলে মৃত ইলিশের মতো ঘুমায় সে বিবেক,
ডোমের হাতে বন্দি হয় আলোর দুপুর।
কুয়াশার ফাঁদে আটকে পড়া নারীর সম্ভ্রম দিনে-দুপুরে লুট হয়।
নষ্ট হয় রাতের শিশির,
সদ্য ফোটা কুমড়ো ফুল।

কুহক

বেদনার দরজাগুলোর খিল খুলতে গিয়ে দেখি সেখানে অনেক বছরের কষ্টরা জমা হয়ে আছে। যা জহরের মতো নীল, তা আজও স্রষ্টাকে দেখানো হয়নি। অথচ প্রতিদিনই সেই মহানুভবের কাছে হাঁটুগেড়ে নত হই। সুরের অন্তর্জাল সরিয়ে তাঁর সাথে কথা কই। কিন্তু বলা হয় না বেদনার কুর্চি ফুল আর আমার ভিতর প্রস্ফুটিত কোরো না। দরদালানের ভেতর মাকড়সার জালে আটকে পড়া মনে আজকাল প্রায়ই প্রশ্ন জাগে—'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই?' যক্ষ্মার মতো স্মৃতিক্ষয় রোগ হয়েছে যার, সে মনে করতে পারে না চুনকড়ি নদীতে মধুরিমার শরীর কেন ভেসেছিল? নদীর অতল জলেও তার নীল শাড়ির কলঙ্ক কেন ঘোচেনি? জ্যোৎস্না পোহালে জীবনের যে খেদ মিটে যায়—এমন যারা ভেবেছিল তাদের জানালায় প্রতিদিন একটা শাদা বিড়াল এসে বলে গেছে তার বেকার আলসেমি জীবনের কথা। বলেছে,

'ক্যাম্পে'র 'ঘাই হরিণের' আর্তস্বর ট্রামের ক্যাচারে আটকে পড়েও কবি শুনতে পেয়েছিলেন। ঈশ্বর কি নরক রাখেননি স্বর্গের তৃষ্ণাকে প্রবহমান রাখতে? তবে কেন এই চড়ুইভাতির আয়োজন? ছেড়ে যেতে হবে জেনেও এই ধরে রাখার 'ইন্দুর-বিলাই' খেলা!

বৃষ্টি ও কিছু নস্টালজিয়ার গল্প

‘এই ঝুম বৃষ্টিতে ছাতাটা ফেলে গেলাম কি না’—এমন কথা আমাকে কখনো কেউ বলেনি।
কেউ বলেনি, ‘তুমি দেবদাস হলে আমি পারু হব।’
এই যে সারাদিন বৃষ্টিতে গাছের পাতারা ভেজে;
কিন্তু কোনো চোখ তো আমার জন্য ঝাপসা হয় না।
ওড়নার মতো বাতাসের ঝাপটায় ঘুম ভাঙে না।
কেউ একজন আমাকে বলেছিল, ‘তুমি শরৎচন্দ্রের মতো নারীর মন বুঝতে শেখো দেখবে ভালোবাসা আপনা-আপনি আসবে।’
অথচ তাঁর মন নিয়েই আমি গোলাপ চাষ করেছি তেইশ বছর!
কিন্তু সে এখন অন্য ঘরে রজনিগন্ধার গন্ধ ছড়ায়।
সারাদিন বৃষ্টিতে শালিকের ডানায় জল জমে,
অথচ ভেজার জন্য বিশ্বস্ত কোনো হাত কেউ এগিয়ে দিয়ে বলে না, ‘এই হাতে জল আছে ছোঁবে?’
মনের ভেতর টাঙ্গুয়ার হাওর অথচ কী ভীষণ জলতেষ্টা আমার।
কেউ একজন বলেছিল, ‘তোমার চোখ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো, পড়ি আর মুগ্ধ হই। তা প্রেমে পড়ার মতো সুন্দর।’
অথচ সে অন্ধ একটি ছেলেকে ভালোবেসেছিল।
আমি তাঁকে অন্ধের মতো চেয়েছি,
সে আমার চোখটা দেখেছে অন্ধ ভালোবাসা দেখেনি।
বেকার জীবনে কেউ একজন বলেছিল,
‘বৃষ্টিতে ভিজতে ভেজা চুলের ঘ্রাণ লাগে,
বেগুনি শাড়ি পরা বিশ্বস্ত একজন নারী লাগে;
বাধা মাইনে আর একটা বাধা চাকরি লাগে।’
কই আমি তো এর কোনোটাই পাইনি।
আমি তো জানি বৃষ্টিতে ভিজতে দুঃখ লাগে,
রাশি রাশি দুঃখ,
নীলাভ মেঘের মতো দুঃখ;
লাল-নীল-বেগুনি দুঃখ।

রাজহাঁসের গল্প ও একটি নিরীক্ষাতত্ত্ব

এইসব রাতের গল্প যা রাজহাঁসেরা জেনেছিল ছায়া পড়া গভীর জল থেকে। কফিনে তার সদ্য মৃত মুখ নক্ষত্রের মতো শাদা। রাতের ট্রেনের ভেতরে যে হকার রেশমি চুড়ি বেচে ফেরে সে তো চুড়ি বেচে না সে স্বপ্ন বেচে। আমি এমন স্বপ্নের দামে প্রেম কিনেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না প্রেম মৃত হলে একদিন রাজহাঁস হয়ে ফিরে আসে। তার প্রতিটি শাদা পালকে মৃত্যুর লোবাণের স্বাদ। অথচ আমি অমরত্ব খুঁজেছিলাম বেশ্যার কোঁকড়ানো চুলে, নাভিমূলে; সরাইখানার মদে। টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য গণনা করিয়ে এক জুয়াড়ির সঙ্গে 'তোমার চোখে নেশা হয়—এই তত্ত্ব নিয়ে বাজি ধরেছিলাম। সে জুয়াড়ি জানে না আমি একদিন জিতে সারা জীবনের জন্য হেরেছি। যারা বলেছিল একটা রাজার জীবন আমি যাপন করেছি তারা আমার পোশাক দেখেছে; দেখনি আমি কতটা বোহেমিয়ান। ভেতরে ভেতরে কতটা মরুভূমি কিংবা ভিসুভিয়াস। একটা বানর খেলা খেলেছ তুমি আমার সাথে। আমি যখন তোমার বশ তখন তুমি পৃথিবীর সাতশ কোটি মানুষের জনারণ্যে ছুড়ে ফেলেছ আমায়। দূর থেকে ডুগডুগি বাজিয়েছ; আমি অদৃশ্য সুতোয় চারদিকে ঘুরপাক খেয়েছি আর প্রেতের মতো পৃথিবীকে পাহারা দিয়েছি। দেখেছি মিছিলের পর প্রেমিকও কতটা শান্ত পুরুষ। পলিমাটির মতন নরম তার কণ্ঠ। তারপর দেখেছি স্বর্গ থেকে হাজারো রাজহাঁসেরা রোদ আনে। সেই রোদে সয়লাব হয় অন্ধ চোখ, কয়লার মতন রাতের আঁধার।

পুতুলনামা

কোনো কোনো দিন ঘুমের ভেতর গ্রামের হাটের বায়োস্কোপের ডুগডুগিটা বেজে ওঠে। কিন্তু গজমতির হার, রহিম-রূপভানের পালা, সাত সাগর তেরো নদী, ডালিমকুমার, কঙ্কাবতী, তাজমহল বা চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙা দেখা হয় না আমার। স্বপ্নের সুতোয় আকাশে ওড়ার আগেই একটা ক্ষুধার্ত শকুন আকাশের নীল চুষে নেয়। তোমার কাছে কাঠবাদাম খেতে আসে কলোনির যে বানরের দল তুমি জানো না গত রাতে ওরাই তোমার অ্যাকুরিয়ামের সোনালি রঙের কচ্ছপ চুরি করে নিয়ে গেছে। কলোনিতে ভোরবেলা গোলাপ গাছে যে একজোড়া মৃত চোখ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বহু অনুসন্ধানে তা জানা গেছে ওটা জামান সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর চোখ। যার লাশ চক্ষুহীন বিবস্ত্র হাত বাঁধা অবস্থায় তেরো দিন আগে কলোনির সেফটিক ট্যাঙ্কে পাওয়া গিয়েছিল। সেদিন পূর্ণিমা ছিল। আজকাল মেঠো পথ নদী হয়, নদী কুয়াশা হয়, কুয়াশা মেঘ হয়, মেঘ পাহাড় হয়, পাহাড় জিরাফ হয়, জিরাফ কালো ঘোড়া হয়, কালো ঘোড়া নেকড়ে হয়, নেকড়ে বিষধর গোখরা হয়। এই যে তোমার রূপের এত গুঞ্জন অথচ তুমি ল্যাংড়া সোহেলের সাথে পালিয়ে গিয়ে মানুষের গুঞ্জনে ছাই দিয়েছ। সে রহস্য আজও অপাঠ্য। নীলকণ্ঠ পাখির পালকে এখন খোলে না কারও হৃদয়। বুনো মোষ তছনছ করে দিয়ে যায় শখের বাগান। চিলেকোঠায় নামে না ভীরু বিকেল। কলোনির কাজের মেয়ে বিলকিস পোয়াতি হলে হাজি আকবর মৃধা কেন সবাইকে মিষ্টি বিলায়—এ প্রশ্ন কারও মনে জাগে না। তুমি জানো না শিমুল তুলো কেন ওড়ে পুবের বাতাসে। মানুষ পুতুল হয়, পুতুল মানুষ হয় কেমনে তুমি জানো না।

আমি যা কিছু ভালোবেসেছি : ০১

আমি যা কিছু ভালোবেসেছি,
তার প্রায় সবকিছুই আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে।
গড়াই নদীর জলে বিকেলের সূর্য ডুবে যাওয়া;
নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড, কেয়া সিনেমা হলের ঘুপচি গলি, আঁকাবাঁকা রেললাইন আর ভোরের শার্টল ট্রেন।
ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত খেয়ে যখন সাইকেল নিয়ে কলেজের উদ্দেশে রওনা করেছি; তখন দেখেছি পাশের বাড়ির কুসুমদিকে খোলা চুলে ছাদে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে।
চোখের নিচে রাতজাগা কালশিটে দাগ।
অত ভোরে কুসুমদির ওঠবার কথা নয়,
কেন জানি কুসুমদিকে ওভাবে দেখে আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল।
বন্ধুরা কুসুমদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমাকে বলত, 'তোর কুসুমদি কী হ্যাংলা রে তোর দিকে কেমন ড্যাবড্যাব চোখে তাকিয়ে থাকে।'
আমি বলতাম, 'দিদির খুব কষ্ট, গত বর্ষায় জামাইবাবু মারা গেছেন।'
কিন্তু বলতাম না কুসুমদিকে লুকিয়ে লিপিস্টিক আর চুড়ি কিনে দেওয়ার কথা;
কেয়া সিনেমা হলে একসাথে ছবি দেখার কথা।
গড়াই নদীতে ঠা ঠা রোদে নৌকা ভ্রমণের কথা;
কিংবা নরেনদাকে দিদির চিঠি পৌঁছে দেওয়ায় একলা ঘরে আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে দিদির চুমু খাওয়ার কথা।
বলতে দ্বিধা নেই কুসুমদি আমাকে পুরুষ করে তুলেছিল।
তার আগে আমি ছিলাম নিতান্ত কিশোর।
সেই কুসুমদির বিয়ের দিন আমি বসন্তপুর যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম।
নরেনদার সাথে কুসুমদির বিয়ে হয়নি।
কিন্তু বিয়ের দিন কুসুমদি আমাকে কেন খুঁজেছিল ও আমার নাম ধরে কেন কেঁদেছিল পরে তা জানতে পেরেছিলাম।
আমি কুসুমদির প্রেমে পড়েছিলাম।
কুসুমদিও কি তবে...?
যেদিন মা মারা গেল সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল।
মায়ের গায়ের গন্ধ আমি কোনো দিন ভুলব না।
মা বলতেন, 'অন্তর তোর জন্য লাল টুকটুকে একটা মেয়ে খুঁজে নিয়ে আসব। দেখবি আমার মতো সেও তোকে ভালোবাসবে।'
সেই লাল টুকটুকে মেয়ে আসার আগেই মা আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে।

লাল টুকটুকে মেয়ে আমার আর দেখা হয়নি, চেনা হয়নি।
মাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মা লাল টুকটুকে মেয়েরা কি দেখতে কুসুমদির মতো হয়?'
মা হেসে বলেছিল, 'পাগল ছেলে আমার! কুসুমের মতো হবে কেন ওরা পরিদের মতো?'
'মা, পরি কেমন হয় তার কি দুটো পাখনা থাকে?
কুসুমদির দুটো পাখনা থাকলে তো তাঁকেই পরির মতো দেখাত।'
মা বলত, 'তোর মাথায় কুসুম ছাড়া আর কেউ নেই বুঝি?'
আমি যা কিছু ভালোবেসেছি তার প্রায় সবই আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে।
কুয়াশার মতো কেবল স্মৃতিরা আমাকে ছাড়েনি।
আমার থাকবার ঘরটা, বাড়ির উঠোনের মেহেদি গাছটা, শৈশবের দোলনা আর টমটম গাড়িটা আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে।

আমি যা কিছু ভালোবেসেছি : ০২

আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে
কুসুমদির হাত,
মালতীদির নাকের বেশর
অপর্ণার ছলছল চোখ,
আর চিত্রার চোখের কাজল, বুকের ব্যাংকে জমানো অভিমান।
বউঠানের সকাতর চাহনি,
পিসির জলের গেলাস।
মায়ের আঁচলের ছায়া, গায়ের গন্ধ আর ভাতের লোকমা।
বাড়ির পেছনের পুকুরপাড়,
ডুমুর গাছ।
পুবের জঙ্গলের ভেতরের পাকা বেতফল।
আমি যা কিছু ভালোবাসি,
তার সবই পাখির পালক হয়ে যায়।
ছুঁতে গেলেই তা মেঘে ভাসে,
যোজন যোজন দূরে চলে যায়।
আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে পরানপুরের বৃষ্টি, মায়াবতী বিল, সোহাগপুরের রেলস্টশন, নিমতলির গঞ্জ।
আমি যা কিছু ভালোবেসেছি মনের সিন্ধুকে তার একটা ফর্দ করে রেখেছিলাম।
কুসুমদি এক চৈত্রের দুপুরে তা দেখতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'দেখাস তো ফর্দটা ওখানে আমি আছি কি না দেখব'খন।'
আমি ফ্যাকাসে হয়ে তখন ঘেমে নেয়ে একাকার। কুসুমদি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল,
'তুই অল্পতেই বড্ড ভয় পাস অমলেন্দু।
এই সাহস নিয়ে শহুরে মেয়েদের সঙ্গে মিশবি কী করে?'
পরানপুরের বর্ষা, তেমাথার কদম গাছ আর ডিগ্রি কলেজের বাংলার লিলি ম্যাডামকে আমার ভালো লাগত।
ম্যাডামের দিঘল চুল আর ডাগর চোখের প্রেমে পড়েছিলাম বলে কুসুমদি এ নিয়ে আমার সাথে কত হাসি তামাশা করত।
ম্যাডামকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভালোবাসা কী?
ম্যাডাম বলেছিল, 'ভালোবাসা হলো মায়া।'
আমি পরানপুরের মায়া ছেড়েছি,
কদম ফুলের মায়া ছেড়েছি।

হেডমাস্টারের মেয়ে আরশির অশ্রুভেজা চোখ ছেড়েছি।
সোহাগপুরের রেলস্টেশন, মায়াবতী বিল, কুসুমদির বাহুডোর, অপর্ণার মাথার দিব্যি ছেড়েছি।
আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে নিমতলির পোস্ট অফিস, বন্ধুর বোন কাঁকনের প্রেমপত্র, টালির চালের ওপর কুয়াশা বৃষ্টি, বিনুর চন্দ্রমুখ, অগ্রহায়ণের রাতের খইজোছনা।

শঙ্খজীবন

অনেক দিন ধরে তন্দ্রার ভেতরে ধোঁয়াটে স্বপ্নেরা এসে আমাকে জাদুকাটা নদীতে নিয়ে যায়। আমার ঘুমন্ত শরীর ফেনায়িত ঢেউয়ের ভেতরে ভাসে আর ডুবে। জোয়ারে লবণ জলে নোনা হয় সে দেহ। অমাবস্যায় তোমার চুলের মতো ভেজা অন্ধকার চোখের ভেতরে ঢুকে পড়ে। যে চোখের মণি ফারাহ যুগে মমি করা হয়েছিল। পিরামিডের শীতল পাথরের কফিনে ঘুমিয়ে ছিল যে চোখ সহস্র শতাব্দী। এই যে চাঁদের আলো যা কতশত সৌর বছর ধরে জোনাকিরা পেটে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পিগমি জাতিগোষ্ঠী তা জানে না। তোমার ছায়াচ্ছন্ন মুখে পৃথিবীর মানচিত্রের প্রাচীন রেখা কতটা জালের মতো ছড়িয়ে আছে তুমি জানো না। বিষুবরেখাও এর চেয়ে কি স্পষ্ট? প্রতিটি জোৎস্নার উৎসবে শালিকের হৃদয় কিনতে যায় যে কবি, শাদা শাড়ি পরিহিতা মধুরিমা ব্যানার্জী তাঁকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়। ধূপের গন্ধের ভেতর কুয়াশার শাড়ি পরে নারকেলের নাড়ু, বরফকুচি মেশানো জল আর গুড়ের সন্দেশ নিয়ে কেউ একজন বারবারান্দা দিয়ে ছায়া শরীর নিয়ে হেঁটে যায়। ছাতিম ফুলের মতো যার শরীরের গন্ধ। ঘোলাটে রোদ কর্পূরের মতো উবে যায়। কবরের অন্ধকারের মতো তার মুখ ভোরে ঘুম ভাঙা তরুণীর মুখের মতো বিধ্বস্ত দেখায়। জাদুকাটা নদী কলকল শব্দে ঢুকে পড়ে মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায়। রক্তের ভেতর ফোটে নাগলিঙ্গম। লিলুয়া বাতাসে সুরমার সুবাস। শঙ্খের জীবন চেয়ে নিতে শামুক হয়ে নেমে পড়ি জলে, জাদুকাটায় ভাসি। বানভাসি হয় আমার দুঃখের নদী, কষ্টের মিনার আর বেদনার গম্বুজ।

উদাত্ত আহ্বান

একবার ভালোবাসতে দিয়ে দেখো,
তোমার হৃদয়ের গভীরে ফুল হয়ে ফুটি কি না?
এই যে জলের কলে তোমার হাতের স্পর্শ, বিছানার চাদরে তোমার চুলের ঘ্রাণ;
বুক শেলফের বইগুলোতে তোমার হাতের যত্নের বাড়াবাড়ি;
আমি কি কোনো দিন তা অস্বীকার করেছি?
আমি তোমার ছায়ার পাশে হাঁটতে হাঁটতে তোমার চোখে দেখেছি বিকেলের শেষ সূর্য ডুবে যাওয়ার দৃশ্য।
স্টেশনে ট্রেন ছেড়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভেবেছি আবছায়া রেল জানালায় সেঁটে থাকা মুখটি তোমারই হবে।
কারণ ততদিনে আমি ড্রেসিং টেবিলের আয়না হয়ে তোমার মুখটিই মুখস্থ করেছি এবেলা-ওবেলা।
একবার কাছে আসতে দিয়ে দেখো,
আমি জয় গোস্বামীর মতো বলতে পারি কি না, 'পাগলী তোর সঙ্গে ঝোলভাত জীবন কাটাবো।'
অসুখে-বিসুখে তোমার সেবা, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তোমাকে পাওয়া, দরজার চৌকাঠজুড়ে তোমার থাকা আমি কি বিস্মৃত হয়েছি?
কিংবা বিকেল ফুরিয়ে যে রাত এসেছিল আমাদের নেশাতুর করতে আমরা কি ভুলেছি সে রাতের কসম?
আমি টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলো হয়ে দেখেছি তোমার ঘুমন্ত শরীর, কপালের টিপ আর বুকের ভেতর আলো-আঁধারিতে লুকানো ভালোবাসা যা তুমি রোদ থেকে আড়াল করে রাখো।
তোমাকে চিন্তা করা ছাড়া আমার সব ব্যস্ততা বেকার বলে মনে হয়।
একবার বিশ্বাস করে দেখো,
কেমন হুলুস্থুল করে দিই দুনিয়া।
তুমি জানো না খালিশপুর কলোনির অলিতে-গলিতে তোমার গল্প রূপকথা হয়ে গেছে।
তোমাকে পেয়েছি এমনটা মনে হলেই তোমাকে হারায় বেশি,
এইসব সাদাসিধে ইচ্ছেরা জেনে গেছে;
তুমি তাদের আবদার রাখবে।
এইসব ঘর-দোর, ছায়া ছায়া আঙিনা,
মেঘ ভাঙা জোছনারা আমার মতো করে তোমাকে পড়ে যায়।
ঘুমঘোরে।

রূপকথা ও নির্জনতার গল্প

শাদা ঘোড়ার কেশরের ভেতরে হিম সন্ধ্যায় কীভাবে তেপান্তরের মাঠ ঢুকে পড়ে জানা হয় না। কিছু পাহাড়ি তরুণীর হাসির শব্দ বয়ে নিয়ে বেড়ানো জোনাকিরা সমতলের নদীতে নেমে আসে। কর্ণফুলির জলে স্নান সেরে দুধে-আলতা রঙের যে জলপরিরা আশ্বিনের নাতিশীতোষ্ণ চাঁদের আলোয় চুল শুকাতে দেয় রূপালি ইলিশের সাথে সখ্য গড়তে তাদের আর ফেরা হয় না সমুদ্রে। যে শামুক বালুকাবেলায় হাঁটতে হাঁটতে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার যুগে পথ হারিয়ে ডুবে গিয়েছিল আরব সাগরে; সেও কোনো এক ভরা পূর্ণিমার রাতে সিঁদুরের কৌটো যখন গহিন জলে ভাসায় এয়োতি নারী তখন নিজ ডেরায় সাগু নদীতে ফিরে আসে। জরিতে রাঙানো গাল, শালুকে মোড়ানো খোঁপা, পটচিত্রে আঁকা কাজলরেখার মতো মুখ—এইসব কত দিন আগের কথা। আমি কি ভুলেছি কবোষ্ণ বুকের ওম, শিথানের নীল ডুমুরের স্বপ্ন, রূপোর পালঙ্ক, গজমতি হার কিংবা হীরে বসানো চোখ। বিড়ালের মতো অলস দুপুর যে নির্জনতা বয়ে আনে তা কাফনের কাপড়ের মতো মেঘজীবনকে বিধবা করে তোলে। বাথটাবে গড়িয়ে পড়া জলের শব্দ, পুরনো হুইল চেয়ারের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, দেয়ালে ঝুলানো অশীতিপর রবীন্দ্রনাথের ঋষিতুল্য পোট্রেট; ষাঁড়ের কাঁধের মতো বিকেলের কালচে মেঘ, ট্রেনের পু ঝিকঝিক ধ্বনি—প্রবসবেদনায় কোনো উপশম আনে না। নীলকণ্ঠ পাখির পালক দিলেই আজকাল শত্রু বন্ধু হয়ে যায় না। এইসব সাদাসিধে গল্প আর জলের গান শুনে গাঢ় ঘুমে অচেতন হওয়ার দিনগুলো ক্রমেই অমাবস্যার রাত হয়ে যায়।

দাম দিয়ে কেনা নয়

বেলি দিয়ে কারও হৃদয় কেনা যায় কি না জানি না,
তবুও কেন যেন মনে হলো এই ব্যস্ত শহরে একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী?
কতটা ভালোবাসা জমানো আছে বুকে তুমি চাইলে তা ওপেন হার্ট সার্জারি করে দেখতে পারো।
তুমি বলবে ওখানে তো রক্তাক্ত হৃদয়, ভালোবাসা কোথায়?
আসলে রক্তের ভেতরে ভালোবাসার ফুল ফোটে,
তাই লক্ষ লক্ষ টাকা, হীরের নাকফুল, ক্যানডেল লাইট ডিনার আর;
একুশ বছর ধরে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা কেনা যায় না কিছু কাঁচা বেলিফুল দিয়ে তা হয়তো পাওয়া যায়।
তুমি বলতে পারো, বোকারা ওরকম ফুল নিয়ে হৃদয়ের কারবার করে।
আমি তো বোকা নই,
তবে বেলিফুল হাতে দিতেই তোমার নিথর ঠোঁট কেঁপেছিল কেন?
ভালোবাসা কি আড়াল করা যায়?
কিংবা বহুদিন ধরে তা কি লুকিয়ে রাখা যায় চোখের ভেতর?
নীলাকাশ, সূর্যাস্ত কিংবা দিয়াবাড়ির লেকের জল;
বা,
এ শহরের শুষ্ক বুকে বৃষ্টি ঝরতে দেখে যারা তোমার কাছে ভালোবাসা দাবি করে;
কিংবা,
মনে করে বর্ষার কদম ফুটলে তুমি বেগুনি শাড়ি পরে হাঁটবে আমার সাথে অথবা ভিজবে আমার সাথে তারা কি ভুল ভাবে?
এসব ভেবে ভেবে নষ্ট হয়েছে আমার মধ্য যৌবন।
অথচ ধানমন্ডির লেক, রবীন্দ্র সরোবর, শহিদ মিনার, লালবাগ কেল্লা, হোসেনি দালান, বিউটি বোডিং, সদরঘাট, ইংলিশ রোড, টিকাটুলি লেন তেমনি আছে।
তুমিও কি তেমন আছ?
আজও কি তোমার খোঁপা রাতের বেলিফুলের জন্য অপেক্ষা করে?
কিংবা তোমার চোখে কি বৃষ্টি নামে?
শাদা শাদা বেলিফুলের মতো সে বৃষ্টি, নোনতা তার জল!

খুশবু

শামুকের মতো হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রে ঢুকে পড়ি আজকাল। জলের ভেতর তোমার নাভির খুশবু সেখানেও পৌঁছে যায়। নোনা ইলিশের জীবন, তবুও তার জন্য কত স্বপ্নের ঝুমঝুমি কিনি। চাঁদের পেটে ঢুকে পড়ে শৈশবের স্মৃতি। কিছু শাদা ফসিল এখানে-ওখানে পড়ে থাকে, বহু যুগ আগে সূর্যমুখীর মতো রং ছিল যার। এই যে হাতির দাঁতের পালঙ্ক, নক্ষত্র বৃষ্টি আর গোলাপজলের শরবত যা আমার আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিল তা কি আমি অনেক সৌরযুগ আগে ছুঁয়ে দিইনি? এই যে হুইসেল বাজিয়ে স্মৃতির ট্রেন মাথার ভেতর দিয়ে চলে যায়, কুয়াশার মতো করে প্রতিদিন কাঞ্চনজঙ্ঘায় হামাগুড়ি দিয়ে নামি, রাতের লেপটে থাকা আঁধারে বাতাস হয়ে শনশন শব্দে ঘুমের ভেতর ঢুকে পড়ি। বাদুরের মতো চুকচুক করে পান করি ডুমুরের রস। নখের ভেতরের বিষ আলগোছে ঢুকিয়ে দিই পৃথিবীর পেটে। অতঃপর ইলিশের ডিমের মতো সুস্বাদু সেই বিষে পৃথিবীর চোখে মৃতের মতো ঘুম নামে। রূপোর রেকাবিতে রাখা মগজ ভুনার সাথে আঙুরের মদ পরিবেশিত হয়। নর্তকীর কোমরে ঘুমন্ত রাত চিতাবাঘের মতো ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। শাদা মেঘ, বরফের চাঁই চাঁদের আলোকে জিরো ডিগ্রিত এনে মৃতের শরীরের মতো ঠাণ্ডা করে দেয়। লবণজাত শরীরে আতরের ঘ্রাণ ছাপিয়ে গলিত মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর শিউলি ফুল আর শীতের সকাল ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাতে। সবকিছু গলে নষ্ট হয়, কেবল তোমার অমাবস্যার মতো চুলে চাঁদ আর কেওড়া ফুলের খুশবু কী সতেজ!

এ শহরে ডুবে যায় আলো

হলদে রোদের এ শহর তোমার স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,
এখানে একদিন বেনারশি বিকেল হতো,
প্রবাহিত নদীতে ভাসত চাঁদ, গাছে গাছে পলাশ ফুটত তরমুজের মতো লাল হয়ে।
নীলাভ মেঘ চিরে পদ্মফুলের মতো রাতের জ্যোৎস্নারা তোমার দিঘল চুলের খোঁপায় ফুটত।
পুরনো চিঠির অস্পষ্ট অক্ষরের মতো তোমার মুখ,
এ শহরের ব্যস্ত সদরঘাটে, কমলাপুর রেলস্টেশনে কিংবা গাবতলি বাস টার্মিনালে অনেক খুঁজেছি।
এখানকার রোদ জানালায় তোমার জমানো স্মৃতি কুয়াশার হিমের মতো ঠাণ্ডা।
নিয়ন আলোয় তোমার চোখ ক্যামেরার মতো ফিরে আসে,
রমনার বয়সী বটতলা, চন্দ্রিমার লেক আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাম গাছগুলো যারা জানত; আমাদের প্রণয়োপাখ্যান একদিন পানাম নগরীর মতো প্রাচীন হবে;
তারা আজও রয়ে গেছে এ শহরকে বুকে ধরে।
কেবল আমাদের প্রেম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হয়ে জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে।
তোমার নাভির মতো গোল সূর্যের সোনালি আলোয় এ শহরে ভোর হয়,
বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফুলার রোড, নীলক্ষেত, কাঁটাবন,
এলিফ্যান্ট রোডে তোমার স্মৃতিরা পথচারীদের সাথে পায়ে পায়ে হাঁটে।
এ শহরে ডুবে যায় আলো,
বৃষ্টি নামে,
ঝুম বৃষ্টিতে ভেজে রাজপথ, দোয়েল চত্বর, কদম ফুল আর তোমার চুল।
অলস স্বপ্নেরা বালিশের ওয়াড়ে এসে জমা হয়,
রাতঘুমে তারা বিড়ালের পায়ের মতো চুপি চুপি নেমে পড়ে চোখের আঙিনায়।

স্মৃতিঘর

একটা পুকুরঘাটের বদলে যে বিকেলগুলো তোমার কাছ থেকে পেয়েছিলাম,
শ্যাওলা জলের কাছে তা রেখেছিলাম কিছুদিন।
তুমি তা ফেরত চাওনি কোনো দিন।
একটা স্টেশন, চলন্ত রোদ জানালার বাইরে চিল তাড়ানো দুপুর
ফেরারি মেঘদিনকে ডেকে আনে।
চাবি দিয়ে খোলা হয় স্মৃতিঘর,
অনেক বছর আগে তুমি যে গল্প দিয়ে সাজিয়েছিলে তোমার খোঁপা;
স্মৃতিঘরে সে খোঁপার গল্পগুলো পাওয়া যায় না আর।
কবিতা দিয়ে নারীকে নির্মাণ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে তুমি বলেছিলে,
'কলম দিয়ে ডেকো আমায় আমি পুকুরঘাট হয়ে আসব,
ভেজা দিনে কাঠগোলাপ হয়ে ফুটব।'
দরদালান, পলেস্তারা, কার্নিশের মতো কিছু প্রেম ছিল তোমার,
বনেদি ভেবে তা রেখেছিলাম আমি
তুমি তা ফেরত চাওনি আর।
কাক তাড়ানো রাত,
তোমার চুলের মতো নেমে আসে কোনো কোনো দিন।
তুমি নেই কিন্তু তোমার মতো করে জলমহল, পুকুরঘাট, বিকেলগুলো আছে।

তুমি, অনুভূতি ও উপমার নাম

তোমাকে ভালোবাসব বলেছি বলে তোমাকে ভুলতে পারব না এমন কোনো কথা তো কোথাও লেখাজোখা নেই। গোলাপের প্রতিটি পাপড়ি ঝরে পড়ে নতুন গোলাপ ফোটার জন্য। আমি তোমাকে ভালো না বেসে বুঝতে চেয়েছি তোমাকে কতটা ভালোবাসা যায়। এই যে সারাদিন মেঘলা আকাশ, চোখ বুজলে তোমার ঝুমকো নড়ার শব্দ, বুকের ভেতর ডাহুকের ডাক, চোখের ইশারার হুলুস্থুল ভাষা তুমি বোঝো না। আলোতে তোমার প্রকাশ অন্ধকারের চেয়ে দ্বিগুণ রহস্য তৈরি করে। তুমি চুপ থাকলে পুকুরের জলের চোখে ঘুম নামে; কথা বললে ছাতিম ফোটে অনায়াসে। অথচ দেখো, কুয়াশারা তোমার মতো রহস্যের প্রাচীর তুলে চাঁদের আলোর সাথে দিব্যি প্রেম করে। অথচ তোমার সান্নিধ্যে পরকীয়ায় আসক্ত হয় তরুণ কবি। যার কবিতার নায়িকাদের মতো তুমি হাঁটো, শিরীষ ফুলের খোঁপা করো কিংবা বুকের গোপন তিলের মতো যার কবিতার শব্দ লুকিয়ে রাখো বক্ষবন্ধনীর ভেতর উষ্ণ কোমল আঁধারে। যে নাগরিক কবির কবিতা শহরের নামি-দামি কোনো সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়নি কোনো দিন অথচ তুমি তা ছেপেছ তোমার চোখের পাতায়, কাজলের অক্ষরে; তোমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ঘাম ও জলের রেখায়।

অন্তর্যামী জানে

আজানের মতো করে ডাকি তোমায়,
কোনো সাড়া দাও না তুমি।
ভোরে ভাবি দুপুরে পাব;
দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল নেমে আসে সাঁঝের দরজায়, তখন মনে হয় এই বুঝি সন্ধ্যামালতীর মতো ফুটবে বারান্দায়।
রাত বাড়ে,
জোয়ারের জল বাড়ে;
কেবল প্রার্থনায় তোমাকে চাওয়া হয় না আর আগের মতো।
এই যে লোভে পড়ে পড়ে দুনিয়া কিনেছি সহস্র দিরহাম দিয়ে;
তাজমহল গড়েছি তোমাকে অমর করব বলে,
সব নদী আর মেঘকে ইন্টোরিয়ারে করেছি বন্দি।
তবুও দেখো সামান্য সর্দি-জ্বরে আজকাল মৃত্যু চিন্তা পেয়ে বসে;
সময় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে গভীর ভালোবাসা কতটা অগভীর ছিল করোনাকালে।
যতটা ডেকেছি তোমাকে সরবে,
ততটা কি তুমি ভেবেছ আমাকে নীরবে?
গজলের সুরে সুরে ডাকি,
ধ্যানের মগ্নতা নিয়ে তোমাকে যে আঁকি;
কী করুণ মায়ায় তোমাকে চাই।
তবুও এ বিস্তর ব্যবধান ঘোচে না,
তুমি শোনো না আমার নাম, পড়ো না আমার মায়ায়, রাঙাও না হৃদয় আমার রঙে।
তোমার জন্য হোটেল টিউলিপের লনে দাঁড়িয়ে সমুদ্র হওয়া।
একটা জনম ঢেউ গুনে গুনে কাটিয়ে দেওয়া;
সূর্যাস্তে নিভে যাওয়া আলোয় কুহেলির মতো তোমাকে খুঁজে ফেরা।
গিজারের গরম জলে,
ধোঁয়া ওঠা ফেনা ভাতে;
বুকের ভেতরে স্পন্দন থেমে যাবার আগে,
তোমাকে বলেছি, 'এ পৃথিবী সরাইখানা;
প্রচুর সুখে ও ভোগে এখানে আমাকে পাবে না।'
আমি তোমার চোখে আছি,
তুমি আমাকে দেখো না।
আমি তোমার মনে আছি তুমি আমাকে পড়ো না।
তুমি দেখতে পাবে আমাকে,
যখন তুমি আমাকে তোমার করে চাবে না।

একদিন

আমাকে যতটা দেখো তার চেয়েও বেশি আমি অদেখা থেকে যায় তোমার পিঠের তিলের মতো।
একদিন আমি ফিরব না বইয়ের পৃষ্ঠা হয়ে তোমার হাতের নরম স্পর্শ পেতে;
এই যে চায়ের কাপে তোমার ঠোঁটের ছোঁয়া পেতে আমার মিছেমিছি চা পানের কথা জানবে না কেউ।
তুমি জানো না চোখ সবটা দেখে তবুও সে নিজেকে দেখতে পায় না।
একদিন চোখের মতো আড়াল হব,
চশমার রোদ মুছে গেলে কাশফুল হয়ে ওড়া হবে না আর।
একদিন অপেক্ষা করবে তুমি,
তবুও আমি স্টেশনে ফিরব না আর।
একদিন আমি লোকাল বাসের হাতল ধরে আসব না আর;
অথচ তুমি বেগুনি রঙের শাড়ির সাথে শাদা ব্লাউজ পরে ঘেমো মুখে বাসস্টপেজে করবে অপেক্ষা।
রিকশা ভাড়া মেটাতে খুচরো টাকার জন্য আমাকে মনে করবে,
আমার শার্টের ছেঁড়া বোতাম তোমার হাতের মুঠিতে খুঁজব না আর।
হাতের পাঁচ আঙুলকে বলে দিব তারা তোমার মুখ ধরে বলবে না আজ পূর্ণিমা।
আর বলা হবে না চন্দনের সুগন্ধ পাওয়া যায় ও মুখে।
হেলাল হাফিজের কাছ থেকে তুমি শব্দ ধার করবে কিন্তু আমাকে শোনাতে পারবে না;
আমাকে না দেখে বুকে ব্যথা হবে সে কথা বলতে পারবে না।
আমার হাতঘড়ি, ফুলতোলা রুমালে, টিফিন ক্যারিয়ারে, চশমা আর আশট্রেতে পাবে না আমায়।
আমি আর হকার হতে চাইব না কোনোদিন,
তোমার ভালোবাসার বিজ্ঞাপন করে বলব না—
'এই যে ছবিতে যারে দেখতেছেন সে ইরানি গোলাপের মতো সুন্দরী আছিল।'

নাজুক বিকেলের গল্প

প্রতারিত হতে হতে মানুষকে শক্ত করে ভালোবাসার মন্ত্র আমি শিখে নিই বটের ঝুরি থেকে। যে রোদ শ্লথ গতিতে হেঁটে গেছে টেমস নদীর কিনারায় তার জলে কত শতাব্দীর সভ্যতার পুরনো ঘ্রাণ। এই যে ছায়া যা হংসপালক হয়ে উড়ে উড়ে জুডিয়ান পর্বতমালার গা ছুঁয়ে বেথলেহেমে পৌঁছে গেছে তা জর্ডান নদীর জলকে নোনা হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেনি। পায়রার শুভ্র ডানা হতে চায় মানুষ; অথচ পৃথিবীতে গোলাপের রং লাল বলে গোলাপ তাদের পছন্দের ফুল। সেই লালের নেশায় তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় বসন্ত বিকেলের সব দরজা-জানালা। জলপাই গাছ হলেই কেউ চাইলে সবুজ হৃদয়ের চাষ করতে পারে না। এন্টার্কটিকায় বরফ গলে গলে জল হয় কিন্তু অনুভূতির সমুদ্র তৈরি হয় না। এই যে মানুষের হাট থেকে আমি ভালোবাসার মোহর দিয়ে যে হিংসা কিনেছি তা দিয়ে আর একটা হিমালয়ের মতো সুউচ্চ পর্বত হতে পারত যেখানে। শ্বেতশুভ্র বরফের বদলে লাল গোলাপের চাষ করা যেত। কারণ আমরা মিলিত হলেও দিনশেষে রক্তই আমাদের কাম্য। কে জানত ভালোবাসাকে দেখতে একদিন আমাদের ল্যুভর মিউজিয়ামে যেতে হবে! অথচ একদিন আমি তারে দেখেছি শাপলা ফুলের খোঁপায়, টলটলে জলে, ডাহুকের বুকে। শ্যামল রোদের ছায়ায় ভেসে যাওয়া মেঘপুঞ্জে যে বিকেল নতজানু হই ঈশ্বরের কাছে তাকে আর ঘরে তোলা হয় না আমাদের। আমরা ফেলে আসি শিমুল তুলোর মতো ভোর, শ্মশানের শোক, মত অতীত, অকপট বিশ্বাস, চিরায়ত প্রতিশ্রুতি। প্রেম দিয়ে চুড়ির বদলে কাচ কিনে নিই। তবে কাচ কিনেও আমরা আয়না হতে পারি না।

নিঃশব্দে নির্মাণ

এই পরিচয়টুকু থাক,
সভ্যতা লুপ্ত হলেও পানপাত্ররা যেভাবে থেকে যায়;
সেভাবে থাকুক মেরুন ঠোঁটের প্রত্ন স্পর্শ।
রাজবাড়ির অলিন্দে ঘুঙুরের শব্দেরা কেঁদেছিল একদিন।
তবুও তুমি জানো না কেন মেঘের বুক চিরলে জল বের হয়।
গোলাপের পাপড়ি খসে পড়লে তবুও তাকে কেন গোলাপ নামেই ডাকা হয়।
এইসব অনুভূতিরা থাক,
বাতিদানের আলো জ্বলে উঠুক,
সুরমা জড়ানো চোখ জেগে থাকুক।
চাঁদ এসে ফিরে যাক সাকির মুখ দেখে দেখে।
তুমি তো দেখো না কেমন করে স্রোতে ভাসে কলঙ্ক;
কতখানি জোয়ারে ডোবে প্রেম,
কেমন করে সাঁতার জলে বাঁধে বলো ঘর?
এই আবেশটুকু থাক,
খোঁপায় তোমার অপরাজিতারা আশকারা পাক;
মৃৎপাত্রের শরাবে যদি নিন্দা হয়,
তোমাকে ভালোবাসলে যদি মন্দ হয়;
তবে তুমি তো জানো না,
ঘোর কাটলেও তোমার চুলের খুশবু কেমন করে থেকে যায়।
ঘুম ভাঙলেও আটপৌরে তুমি কীভাবে রয়ে যাও।
এই আবদারটুকু থাক,
চাহনিটুকু রেখে যাও, বিশ্বাসটুকু থাক।
কথাগুলো রেখে যাও, নীরবতাটুকু থাক।
তুমি তো দেখো না কীভাবে পোড়ে মন?
কীভাবে লুপ্ত হয় মোগল ইতিহাস, হেরেমের জৌলুস।
জানো না কতটা নিঃসঙ্গ কুতুব মিনার।

আমাদের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি নেই

দোয়েল চত্বরে একবেলা উপোস থেকে বৃষ্টিতে ভেজা;
আর ভেজা বৃষ্টির ভেতর এক ডজন কদম পাড়া ছাড়া আমাদের উল্লেখযোগ্য কোনো স্মৃতি নেই।
আমরা কলা অনুষদের ডিন অ্যাওয়ার্ড বা গোল্ড মেডেল পাইনি।
প্রথম শ্রেণি পাবার নেশায় লাইব্রেরিতে ঢুকে যারা দিনের আলো দেখেনি;
আমরা তাদের দলে নই।
আমরা জ্বেলেছি প্রদীপ শহিদ মিনারের পাদদেশে।
দারুণ খরায়, প্রবল প্লাবনে, বারুদের গন্ধ ছড়ানো মিছিলে পড়েছি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্।
আমরা শ্রাবণে ভিজিনি, শ্রাবণ ভিজিয়েছে আমাদের।
আমরা সমুদ্র খুঁজিনি, কিন্তু ঢেউ খুঁজেছে আমাদের।
আর সি মজুমদার মিলনায়তনে কোনো সেমিনারে আমরা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিনি,
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণায় আমাদের কোনো জার্নাল প্রকাশিত হয়নি।
সমাবর্তন শেষে সবার মতো উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে কালো মুকুট বাতাসে ওড়াইনি আমরা।
তাতে কী,
মধুর ক্যান্টিনের রসগোল্লা, হাকিম চত্বরের শিঙাড়া, হোটেল নীরবের আঠারো পদের ভর্তা আমাদের চেনে।
আমরা খেয়েছি দোল নাগরদোলায়, মিলেছি মঙ্গল শোভা যাত্রায়।
পালন করেছি একুশের প্রথম প্রহর, জাতীয় কবিতা উৎসবের কুয়াশা বিকেল।
আমরা হারিয়েছি বইমেলায়;
পহেলা ফাল্গুনের ফুটপাতের পসরা থেকে পাতাভরতি টিপ কিনেছি, কিনেছি রং-বেরঙের চুড়ি;
কাছাকাছি থেকেও হলুদ খামে লিখেছি হাজারো চিঠি।
স্মৃতি আমাদের খোঁজেনি, আমরা খুঁজেছি স্মৃতিকে।
আবছায়া এই শহরে জানি আমরা গল্প লিখিনি;
তবুও কেন মনে হয় শতবর্ষ পরে আমাদের নিয়ে গল্প লেখা হবে।

বাদামি আলোয়ানের কাব্য

বাদামি আলোয়ানে জমেছিল যে রোদ,
চিরুনির চুল তা জানত,
জলের কামিজে আটকানো মেঘ;
ছই নৌকায় তাই পেতেছিল জলসংসার।
ভাঙা আয়না, সিঁদুরের কৌটা, জলচৌকি;
এঁটো পানপাত্র, জলের গেলাসে লেগে থাকা আবচ্ছা মুখ জানত—
শামুকের মতো আগলে রেখে রেখে,
কে কবে পেয়েছে ষোলো আনা?
এই যে অর্ধেক চাঁদজীবন ভোরের ঘুমের মতো আয়েশপ্রিয়;
তা কি জানে না গোলাপি পর্দার ফাঁকে ফাঁকে বীণার হাহাকার।
ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা চোখ জানত,
সেফটিপিনগুলো কোথায় জমানো হয়।
ফটোফ্রেমে তোলা প্রেম,
কতদিন সাঁতারু মাছের মতো জীবন্ত থাকে?
মশারিতে বন্দি সুখ, পাশবালিশের আদর;
কতকাল সুগন্ধি তেলে ভাসে?
এসব জানে না যেজন,
ফেনিল জল বুকে ধরে না যে,
কেমন করে হয় তার জলসংগম?
মাটির ঘর-গেরস্থলি!
বদলে যাওয়া দিন,
ছায়া ছায়া জীবন যদি পাঠ করা হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতন;
শাদা-কালো প্রেম বেনারশি হয়ে ফিরত যদি,
তাহলে সিন্দুকে জমানো যৌবন বেশরের মতো নেড়ে-চেড়ে দেখা যেত আবার।
ফোনালাপের যুগ নয় সেটা,
পোস্ট অফিস ভরসা।
অনিলার চিঠি আসবে বলে,
রোববার বিকেল পর্যন্ত দরজার চৌকাঠ হয়ে অপেক্ষা...
মাস শেষে স্টেশনে তার শাড়ির কুচি দেখার সে কী আনন্দ!
তখন কাঠগোলাপের দাম ছিল,
দুই বেণীর চল ছিল;
নীল রুমালে লেখা হতো—

‘ভুলো না আমায়।’
তখন বিরহে ছিল হেলাল হাফিজ, বেদনায় ছিল সুনীল।
বিপ্লবে ছিল চেগুয়েভারা, সংকটে রবীন্দ্রনাথ।
অনিলার জন্য কেনা হতো ভিউকার্ড,
কবিতার বই,
সে বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা হতো তার নাম।
খামে ভরে তা পাঠানো হতো দূর দেশের ঠিকানায়।
সে পাবে হয়তো এই ভাবনায় রঙিন হতো বর্ষা বিকেল, মলিন সন্ধ্যা।

ভেজা ডুমুরের দিন

এইসব ভেজা ডুমুরের দিন আর আসবে না,
বুনো চড়ুইয়ের ঠোঁট কবে না বৃষ্টি আসবে এবেলা ঘরে থেকো পদ্মবউ;
এমন গুমোট দিনে বাইরে বের হয়ো না,
যেয়ো না পুকুরের ঘাটালায়।
নাগলিঙ্গম ফুটবে,
লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে পড়বে বৃষ্টির দানা।
সারা শহর জানবে বৃষ্টি এসেছিল,
অচেনা প্রেমিক যুগল বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে মোষের মতো লাল করবে তাদের চোখ।
লালবাগ কেল্লার সবচেয়ে উঁচু মিনারে বসা কাকের শরীর গড়িয়ে পড়বে বৃষ্টির জল।
নীলু,
তুমি কেবল জানবে না টিপটিপ বৃষ্টিতে ভেজে কার্জন হলের বারান্দা।
ভেজে সাতাশ ফেব্রুয়ারি;
ভেজে ১/এ লাভ রোডের দোতলা বাড়ির চিলেকোঠা।
পদ্মবউ উনুন ধরায়,
তার চুলে বৃষ্টির স্মৃতি জমে জমে জল হয়ে গড়ায়।
জবজবে হয়ে ভেজে তার মন।
বিশ্বাস করো নীলু,
গড়িয়াহাট রেলস্টশনে ফিরোজা রঙের কামিজে যে মেয়েটি বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়েছিল;
আমি ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে ফিরোজা রঙের বৃষ্টি নিয়ে।
তুমি পদ্মবউ হতে পারতে,
বৃষ্টির জলে জবজবে করে ভেজাতে পারতে তোমার মন।
কাঠ-কয়লার উনুনের ধোঁয়ায়;
ফিরোজা রঙের বৃষ্টির দিনে চুপিসারে স্মৃতিঘুমে আসতে পারতে।

ধানতাবিজের বৃষ্টি

তুমি বলেছিলে বুকের ভেতর বৃষ্টি বুনতে,
আমি আকাশটাকেই নামিয়ে এনেছি বুকে।
এখন বুকের ভেতর কুয়াশা নামে,
বিস্যুদবারে মিথিকান্দা স্টেশনে শেষ ট্রেন ছেড়ে যাবার পর;
পুবের মেঘ ডাহুকের ডানার মতো কালো হলো তা তুমি দেখো নাই।
হুইসেল শুনছিলাম আমি,
চুড়ির শব্দের মতো বৃষ্টি নেমেছিল,
ভিজিয়েছিল তোমার নকশিকাঁথার মতো গতর।
পুষ্করিণীর স্যাঁতসেঁতে ভেজা ঘাট,
শ্যাওলা ডুবানো জলের ওপর তোমার ধানতাবিজের মতো বৃষ্টি পড়ে অনর্গল।
কদমের সুবাস ছড়াইয়া যায় তোমার ঠোঁটে,
কোমরে জলের ঘূর্ণি ওঠে।
মাটির হাঁড়িতে রাখা গোখরোর মতো জিদ তোমার, শাওনের জলে ময়রার বাড়ির চিনির সরুয়া হয়ে যায়।
হারিকেনের তেল ফুরায়, আলো কমে;
তবুও সারাবেলা ঝমঝমিয়ে নামা বৃষ্টির বোল থামে না।
আমি আসমানকে বাড়ির ছাদ করেছি,
তুমি সময় করে বৃষ্টি ঝরিয়ো।

নোনাজীবন

জলের কল খোলা, এঁটো বাসনকোসনে দুপুরের রোদ;
কলতলায় ভাতশালিকের কিচিরমিচির,
হাঁসের পালকের মতো বিছানায় লিলুয়া বাতাস ঘুরে ঘুরে যায়।
রূপোর পালঙ্কে টোপর তোলা থাকে;
আলমারির দেরাজে বন্দি নূপুর,
নোনাছাপ দেয়ালের ফটোফ্রেমে রাখা কাদম্বরীর হাসি।
পুকুরের ঘাটলায় সিঁদুরের কৌটা,
ঝরঝর বৃষ্টিতে ভিজে যায় আয়না।
কোরা নারকেলের মতো মেঘ,
ভুঁইচাঁপার দেহে চাঁদের ঘুম নামে।
সুজনিতে শুকনো বকুল,
হাতপাখায় ঘাম
ফুলতোলা রুমালে ডাগর চোখ কাজল সন্ধ্যা হয়ে ওঠে।

তোমার নাম ধরে ডেকে যায়

সন্ধ্যায় পারুল ফুটবে কি না তোমার মুখ দেখে বোঝা গেল না,
অথচ দুপুরে যে বৃষ্টি হলো তোমার চোখে সকালে তার আভাস ছিল।
চুলের সুগন্ধি তেল সারাদিন ছড়িয়েছে ছাতিমের ঘ্রাণ,
দরজার ফাঁক গলে ঘুঘু পাখির হৃদয়ের মতো যে কোমল আলো এসে ছুঁয়েছিল তোমার পা;
সে আলোকে দেখেছি জন্মান্ধের চোখে বিশ্বাস ছড়াতে।
তিতাসের জলে তোমার যে ছবি ফুটে ওঠে,
কতকাল সে জল সাঁতরে খুঁজেছি তোমার নোলক।
বটপাতার মতো তোমার শরীরের ছায়ায় আশ্রয় পায় রবীন্দ্রপ্রেম, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক।
চশমায় জমে থাকা ধুলো ইদানীং খোঁজে তোমার শাড়ির আঁচল।
অভুক্ত বিড়াল তোমার মুখপানে চেয়ে থাকে,
তোমার নারীত্বে সে আবিষ্কার করে মাতৃত্ব।
আজকাল রাত গভীর হলে চাঁদ নেমে আসে,
সারা রাত টিপ হয়ে চুপচাপ বসে থাকে তোমার কপালে।
তোমার চাহনিতে মোহাবিষ্ট হয়ে রয় আকাশ,
মেঘ মেখে নেয় তোমার শাড়ির নীল রং
মধ্য দুপুরবেলা তিতাস তীরে একটা জলময়ূর তোমার নাম ধরে ডেকে যায় অবিকল তোমার স্বরে।

প্রজাপতি এলেই

প্রজাপতি এলেই চির পরিচিত ঢাকার রং পালটে যায়,
কাঠফাটা রোদে কৃষ্ণচূড়াগুলো আরও রক্তিম হয়ে ওঠে।
বুড়িগঙ্গার বুকে যে মাঝি নৌকা ভাসাই, রকমারি পণ্য নিয়ে আসে বাদামতলির ঘাটে;
সেও মুগ্ধ হয়ে দেখে বুড়িগঙ্গার রূপের পরিবর্তন।
চিরচেনা বুড়িগঙ্গার কালচে জল হঠাৎই শুভ্র হয়ে ওঠে;
মায়াবতী জ্যোৎস্নার ঢল নামে বুড়িগঙ্গার তীরে।
প্রজাপতি এলেই হাসান হাফিজ, রফিক আজাদ আর সৈয়দ শামসুল হকের
কবিতার কলম ক্ষিপ্র চিতার মতন নড়েচড়ে ওঠে; প্রসব বেদনায় ছটফট করে।
কবিতা পড়ার আসর বসে হাকিম চত্বরে,
কবিতাপ্রেমীদর আনাগোনা বেড়ে যায় আজিজ সুপার মার্কেটে।
প্রজাপতি এলেই তুমুল বৃষ্টিতে কাকভেজা হয় তিলোত্তমা ঢাকা;
তাঁতিবাজার, বাংলাবাজার, নয়াবাজারের গলিপথ প্লাবিত হয়।
ইংলিশ রোডে, জনসন রোডে, শাঁখারিবাজারের রোডে কাচ্চি বিরিয়ানি আর
বাখরখানির বিক্রি বেড়ে যায়।
প্রজাপতির আগমনে পুরান ঢাকা ফিরে পায় তার হারানো জৌলুস।
প্রজাপতি এলেই মধুর ক্যান্টিনে চায়ের কাপে ঝড় ওঠে,
ডেইলি দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদকের আনাগোনা বাড়ে।
চারুকলার গ্যালারিজুড়ে হাজারো রঙের ঢল নামে;
প্রজাপতি এলেই ঢাকার পাঁচতারকা হোটেলগুলোতে ঠুমরি গানের আসর বসে,
সাকি আর শরাবপ্রেমীদের ভিড় জমে।
প্রজাপতির সম্মানে আরমানিটোলায় ঘুড়ি ওড়ানো উৎসব হয়;
রাতের নীলচে অন্ধকারে ঢাকাইয়া কুট্টিরা ফানুস ওড়ায়।
শহরজুড়ে বাঁকা চাঁদ আর রাত জোনাকির আলোর ঢল নামে।
কাক ঘুমায়, তারারা জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত হয়,
প্রজাপতির জন্য রূপসী ঢাকার নিদ্রাহীন অপেক্ষা;
প্রজাপতি এলেই চারশত বছর বয়সী ঢাকা খোলস ছাড়ে;
স্মরণ করে তার মোগল, পাঠান, নবাবি আমলের প্রত্ন ইতিহাস।

তুমি ও একটি শালিকজীবন

আজ তোমাকে এ পত্র লিখছি,
যখন নোনাধরা দেয়ালে বিকেলের রোদ ফুরোবার আগে দুটো ভাতশালিক এসে বসেছে গায়ের সাথে গা লাগিয়ে। ওরা বলছে ওদের সংসারজীবনের গল্প। দূরে বাতাসে উড়ছে কোনো বধূর আড়ে মেলে দেওয়া লালপেড়ে শাড়ি। শ্যাওলা পড়া নিস্তরঙ্গ পুকুর জল আর রমণীশূন্য ঘাটালায় এখন বোবা ছায়ার উপস্থিতি।
তোমাকে লিখছি এ চিঠি,
যখন পশ্চিমের মেঘ মোষের চোখের মতো লাল। অনেক উঁচুতে ভুবনচিল যেখানে মধ্যাহ্নের পুরুষের মতো একা সেখানে আমার প্রেমময় বার্তা পৌঁছে না। পলেস্তারা খসে পড়ে। ঝুরঝুরে বালি ওড়ে আড়ষ্ট বিকেলের বাতাসে। অথচ এখানে জাফরান দিন ছিল।
সুগন্ধি এলাচের বিকিকিনি হতো। জাহাজের ভেঁপু বাজত।
তোমাকে এ খত লিখছি,
যার কাগজ বহু বছর শূন্য শরাবের বোতলে আটকানো ছিল। তুমি এ কাগজে পাবে পাকা আঙুরের ঘ্রাণ। ঝিনুকের মতো শাদা মুখ তোমার, যা এতকাল শরাবদানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; ভাতশালিক সে মুখের খবর দিয়ে গেছে বিকেলের রোদে। সেই থেকে তুমি গার্হস্থ্যজীবনের গল্পে আছ। কুয়াশার ভেতরে অফিসে যেতে যেতে, বাজারেরে লিস্টে, কফির কাপে তোমাকে পায়। তোমাকে চিঠি লিখি বৃষ্টি বা খরতাপে। কখনো বা একা একা শালিকের মতো মনে মনে। বুকের ভেতর কথা জমিয়ে বানাই কথার পাহাড়।

একটি রঙিন দুপুরের অপেক্ষা

তোমাকে প্রেমময় আলিঙ্গন প্রিয়তমা,
তুমি না চাইলে এ বিজয় সম্ভব হতো না।
তোমার প্রগাঢ় প্রেম আমাকে দিয়েছে এ রাজ্য জয়ের অনুপ্রেরণা।
এক একটা দুপুর তোমার ওড়নার মতো রঙিন হয়েছে;
কোনো কোনো রাতের চাঁদ তোমার মুখের মতো অবিকলরূপে এসে দাঁড়িয়েছে
আমার দুয়ারে।
আমি তখন যুদ্ধের সাজে তাঁবুতে শেষবার নিজেকে দেখে নিতে ব্যস্ত
নিশি ভোর হবার আগে তোমার সুরমা টানা চোখ আমাকে দেখে যায়।
তোমার জন্য নিবিড় উষ্ণতা প্রিয়তমা,
এ বাতাস তোমার কাছে ঋণী;
সে তোমার চুলের খুশবু বয়ে এনেছে এ যুদ্ধের ময়দানে।
শত ষড়যন্ত্র, শাঠ্য আর নীলনকশা পেরিয়ে তোমার প্রেমের দামামা বেজেছে এখানে।
তুমি চেয়েছ বলেই গোলাপ ছেড়ে বন্দুক তুলে নিয়ে আমার এ যুদ্ধসাজ;
এ নীল মেঘ জানে যুদ্ধ মানে তোমাকে ছেড়ে থাকা,
তলোয়ারের সাথে বসবাস।
তুমি মানে একটি রাজ্য,
কোটি কোটি নক্ষত্র আর তারার বাস সেখানে।
তোমাকে প্রীতিসিক্ত ভালোবাসা প্রিয়তমা,
তুমি চেয়েছ বলেই আমি প্রেমিক থেকে যোদ্ধা হতে পেরেছি;
সরাইখানা থেকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তোমার মনের দরজায় পৌঁছে গেছি।
এই যে আপেলের মতো রং তোমার যে দেহের তাতেই বুঁদ হয়ে যাই আমি;
তুমি মানে একটা সাম্রাজ্য,
সেখানে অজস্র বৃষ্টি, গাঙশালিক আর ভেজা মেঘের আনাগোনা।
তোমাকে রাত জাগা বিনিদ্র স্বপ্নভুবনে আমন্ত্রণ প্রিয়তমা,
তুমি চেয়েছ বলেই আমি বিদ্রোহ দমন করেছি,
শান্তির খত লিখে পাঠিয়েছি শত্রুর কাছে।
তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে করেছি সন্ধি;
তুমি মানে ভালোবাসার তল্লাট,
সেখানে লাখো লাখো চড়ুইদের ডানা ঝাপটানো।
তোমার জন্য আরক্ত চোখের অপেক্ষা প্রিয়তমা,
এ যুদ্ধময় পৃথিবীতে তোমার ওড়নায় পারে একটি রঙিন দুপুর এনে দিতে।

প্রস্থান

তোমার চোখ দেখার তৃষ্ণা কি পানপাত্র মেটাতে পারে?
একসাথে জোছনায় ভাসব বলে কথা দিয়ে আমাকে হঠাৎই আসতে হলো হিমঘরে।
বাইরে পড়ে রইল টুকরো দিন, খুনসুটি আর জলজ সন্ধ্যা;
কোনো প্রস্তুতি ছাড়া তোমাকে রেখে এলাম অনিশ্চিত জীবনে।
বরফবিছানায় শুয়ে পানপাত্রে দেওয়া যাবে না চুমুক;
উষ্ণ হবে না কথা বিনিময়ের রাত,
শীতল ঠোঁটে তোমার জন্য হেলাল হাফিজের কবিতা পড়া হবে না।
মধ্যরাতে মদির হবে না চোখ তোমার আনত নয়ন দেখে।
চিম্বুক পাহাড়ে উঠে আর আমাদের উড়ন্ত মেঘ ছুঁয়ে দেখা হবে না,
কত যুগ এখানে শুয়ে আছি তা কেউ বলল না;
এখানে এই অন্ধকারে আমার শুভ্র চুলে কেউ বিলি কেটে দেবে না আমি জানি,
অথচ তুমি দিতে পারতে;
তোমার কাঁধে মাথা রেখে আর একটা চন্দ্রগ্রহণ দেখব বলে কথা দিয়েছিলাম।
ঝুম বৃষ্টি যাপন করবে বলেছিলে একদিন,
বড় একলা তোমাকে রেখে এলাম।
রাতের চাঁদের মতো সঙ্গীহীন,
ভীষণ ঠাণ্ডা এ ঘরে পাব না তোমার হাতের স্পর্শ।
প্রতিদিন বিকেলে তোমার মন এখানে আসবে না আমার দেখভাল করতে।
আর সাঁতরে পার হাওয়া হবে না পদ্মদিঘি,
লেখা হবে না দীর্ঘ চিঠি;
আমাদের দেখা হবে না রেডফোর্ড, কুতুব মিনার, তাজমহল।
উড়ো মেঘে ভাসব বলে তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে মেঘদিন আর
আসবে না আমাদের জীবনে।
এই হিমঘরে পানের পিয়ালা নেই, জানালার কার্নিশ নেই, হলুদ রোদ নেই;
শাদাটে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এর চারদিকে তোমার মুখ এখানে স্মৃতির মতো অবশ।

চিঠি : ০২

হলুদ খাম, শাদা কাগজ, আর কালো কালির প্রেমে পড়ো তুমি।
চিঠি ভালোবাসো,
মানুষকে ভালোবাসো না।

তোমাকে জানতে চেয়ে

জল চেয়ে চেয়ে জলতৃষ্ণা ফুরিয়েছে আমার,
যে পথ ধরে তুমি এসেছ দূর দেশের খবর নিয়ে;
সে পথের শিশির জানে আমি কত রাত করেছি বিনিদ্র অপেক্ষা।
পাইন গাছের সারি থেকে নেমে আসা বাতাস গির্জার সুউচ্চ মিনার স্পর্শ করে;
তোমার চোখে তখন মধ্যদুপুরের রোদ।
উড়ন্ত চুলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধোঁয়া কী গভীর রহস্যের মেঘ নামিয়ে আনে,
জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ধরা পড়ে কতশত কোটি আলোকবর্ষ দূরের তোমার প্রাচীন মুখ।
শ্যাওলা জমা পথে আর ফিরবে না জানি;
রেলপথ ধরে যে পথ চলে গেছে তোমার মনবাড়ি,
ভেবেছি এতদিন।
আসলে তা মিশেছে এক জংশনে গিয়ে।
তুমি মানে ছেড়ে যাওয়া ট্রেন,
সুনসান স্টেশন;
কুয়াশার ভেতর একটা ফড়িঙের নিঃশব্দে ওড়াউড়ি।
একটা ঘুঘুর একাকী বিরহ যাপন।
এই যে আদিগন্ত নীলমেঘ আর ভেজা বাতাসের ভেতর তোমার চোখ আর না দেখা কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকা, গ্যালাক্সির ভেতরে তোমার শূন্যতা খুঁজে ফেরা।
ভুবন চিল হয়ে আকাশে আকাশে ডানা ঝাপটানো,
সবই তোমার মন পাওয়া আর না পাওয়াকে ঘিরে।
চলন্ত ট্রেনের মতো আমিও একদিন হাজির হব তোমার প্রাচীনতম পৃথিবীর জংশনে।
সেদিন তোমার শ্যামল মুখ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকবে।
কুয়াশার আবরণ সরিয়ে আমরা শুরু করব আমাদের সম্পর্ক নির্মাণের গল্প।
বলব ছোট্ট মফস্বল শহরে আমাদের প্রেম কীভাবে ঝড়ে-ঝাপটায় বেঁচে ছিল।
প্রেমের সেই সরু রেলগাড়িটি একটি মফস্বলের রেলস্টেশন থেকে কেমন করে জংশনে এসে পৌঁছেছিল।
আমরা পেরিয়েছি কত হলুদ নক্ষত্র, জোনাকি রাত, সমুদ্র শহর।
বয়স্ক পৃথিবীর কত কিছু বদলে গেছে;
অথচ তোমাকে জানতে চেয়ে জেনেছি,
মহাবিশ্ব এখনও তোমার মতো কত রহস্যময়।
আর তোমার চোখের মতো নতুন রয়ে গেছে আমাদের অব্যক্ত প্রেম।

প্রাপ্তি স্বীকার

প্রিয়ে,
এইমাত্র তোমার পাঠানো কদম পেলাম,
কী ঘ্রাণময় আর পুরুষ্ট ওর শরীর;
হলুদ জমিনের ওপর শাদার কী নান্দনিক বর্ণবিভা।
আজ সকালে এখানে এই সখিপুরের আকাশ তোমার মনের মতো মেঘলা।
বৃষ্টি হব হব করছে তবে নামার কোনো তাড়া দেখছি না।
সকালের নাশতা সেরে বিছানায় উপুড় হয়ে বুকের কাছে বালিশ ঠেস দিয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বসেছি কবিতা লিখব বলে;
কিন্তু কবিতারা আজ তোমার ঘনকালো খোঁপায় লুকিয়েছে।
এই মেঘলা দিনে তাদের আর খুঁজে পেলাম না;
সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে,
এরই মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর ঝিরিঝিরি বাতাস বইতে শুরু করেছে।
হঠাৎ করেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ,
দরজা খুলতেই ডাকপিয়ন তোমার পাঠানো কদম আর একখানা চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কী অদ্ভুত দেখো,
সখিপুরে তুমি নেই অথচ তোমার পাঠানো কদমের সাথে তোমার শরীরের ঘ্রাণ এসে পৌঁছাল।
এখনও বাইরে ঝিম ধরা মেঘলা দুপুর,
নিথর পুকুর জল,
সখিপুর জানে তুমি নেই এখানে;
এই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি জানে সে ছোঁবে না তোমার পা।
এই মেঘ পাবে না তোমার হাতের স্পর্শ,
সখিপুরের কদম ফুটবে না তোমার খোঁপায়।
পৃথিবীর সব কদম আজ জেনে যাক তুমি আমাকে পাঠিয়েছ আষাঢ়ের প্রথম কদম;
যে ডাকপিয়নটা বয়ে নিয়ে এসেছে এই চিরকুট, বর্ষা কদম, সে পর্যন্ত জানুক এই প্রেমকাব্য।
আমার এই কলম, কফি মগ, কেতলির গরম জল যা মেঘদিনের অন্যতম অনুষঙ্গ;
তারা জেনে যাক এ কদম আমার কতটা আপনার।
তুমি চিরকুটে জানতে চেয়েছ—
কদম আমার প্রিয় কি না?
স্নানের ঘরে তোমার শরীরের ঘ্রাণের মতো কদমের ঘ্রাণ আমাকে উন্মুখ করে।
সমস্ত চেতনা আমাকে ঘ্রাণে ভরিয়ে তোলে;
সখিপুর তোমার আগমনের অপেক্ষায় প্রিয়,
এ আষাঢ় তোমার সান্নিধ্য তৃষিত পিয়াসী প্রিয়ে।

তবুও সে ভালো থাকুক

এই রোদ পোড়া দুপুরে আমার চোখ পুড়ে খাক হোক,
তবুও সে ভালো থাকুক।
আমার জন্য অথই কষ্টের দিঘি না হয় ভরা থাকুক;
একশ একটা নীল খামের চিঠি যদি আসে আসুক,
এই দুপুরে খরতাপে মিঠে জল নাই বা জুটুক
তবুও সে ভালো থাকুক।
বেলা বোসকে পায় না সবাই,
তবুও তারা স্বপ্নে বাঁচুক।
এক জীবনে আমি না হয় যমুনা সাঁতরে দুঃখ খুঁজেছি,
সবাই যখন ঘুমঘোরে;
আমার তখন কীসের অসুখ?
বুকের ভেতর একটা শালিক ছটফটিয়ে চোখ খোঁজে,
চোখে তখন দুঃখের নদী উথালপাথাল ঢেউ তোলে।
সন্ধ্যামালতী গন্ধ ছড়াক, চাতক বাঁচুক বৃষ্টির জলে;
আমার না হয় দীপ নিভে যাক,
তবুও সে ভালো থাকুক।
আতরদানির আতর ফুরায়, সুরমাদানির সুরমা
জলসাঘরে সে থাকে না থাকে তার ঘাঘরা।
ডুমুরের ফুল আমি খুঁজেছি,
সমুদ্রে ডুব আমি দিয়েছি;
হারানো নাকফুলের আফসোসে রাত ভারী হয়েছে
আমার হয়েছে তাতে কার বা কী যায় আসে?
দুঃখ আমাকে চাবুক মেরেছে,
আমি তাতে নই দুঃখী।
যে ছুরি আমার কোমর কেটেছে তাকে আমি বিশ্বাস করে কোমরে রেখেছি সোনার খাপে;
বিষপানে আমি নীলকণ্ঠ হয়েছি,
তবুও সে ভালো থাকুক।
'তার ভালো হোক'—জিকিরের মতো এ কথা বলেছি,
সে শুনতে না পাক তবুও আমি তাকে বলতে চেয়েছি—
তুমি না থাকা মানে চারদিকটা শূন্য থাকা।
তুমি ছাড়া একশ আমির এক সংখ্যা অস্তিত্বহীন।
খাটিয়ায় লাশের মতো করে শোকটা আমি বয়ে চলেছি,

মৃত্যুমিছিলে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে এই বলেছি—
তবুও সে ভালো থাকুক।
আমার যা গিয়েছে তা একলা আমি সয়ে নেব,
কতটা আঘাত সয়ে সয়ে নদীতে যেমন চর পড়ে।
এমন চর পড়েছে বুকে নাইবা সে না জানুক,
আমার বুকে ভাটার পর, জোয়ার হয়ে সে নাই আসুক
সে যদি কাঁটাও হয় তবুও সে ভালো থাকুক।

ইচ্ছে

তুমি একটা গর্জন গাছ হতে চেয়েছিলে,
আমি বললাম নদী হও না কেন?
তুমি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে জলে অনেক দুঃখ;
সারা জীবন ভাসতে হয়,
সেই থেকে আমি জলে ভাসি আর তুমি বাতাসে উড়ো।

এই শহরকে দেখা

কখনো ঢাকা শহরকে রাতসুন্দরীর মতো মনে হয়, অক্সিজেনের অভাবে ক্লান্ত
ফুসফুস যেমন;
তেমনটা ধুঁকতে ধুঁকতে থাকে এ শহর।
মিডিয়াপাড়ায় নামকরা পত্রিকায় শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকীতে
শিশিরের শব্দ ঝরে পড়ার কবিতা ছাপা হয়।
দিয়াবাড়িতে কাশফুল,
নাগরিক মনকে কবি ও কবিতা সহিষ্ণু করে তোলে। রাতবনিতাদের মতো
পাঁচতারকা হোটেলগুলো বিনিদ্র থাকে;
অন্ধকারের ভেতর ঠেসে দেওয়া হয় আলোর কাটলেট। শহরের হৃৎপিণ্ড কেটে
কেটে যখন বসানো হয়
মেট্রোরেলের স্প্যান,
তখন লালবাগ কেল্লার গোলাপ বাগান ফুলে সয়লাব হয়।
পরীবিবি কি মার্বেল পাথরে বাঁধানো পুকুরঘাটে অঙ্গ ধৌত করতে আসে?
সুউচ্চ মিনারে নেমে আসে কি চাঁদ?
কুয়াশায় ঢাকা পড়ে মসজিদের খিলান, গম্বুজ।
রাতবিলাসীদের মতো ঢাকাবাসী তার খোঁজ রাখে না।
এই যে সারি সারি ফ্লাইওভার, প্রসস্ত সড়ক, তিনশ ফিট রাস্তা, কর্পোরেট জীবন;
ফ্ল্যাটবন্দি একক সংসার।
রাতসুন্দরীদের মতো আনন্দ কেনার ইচ্ছেরা জানে না
ঢাকাইয়া সিনেমার স্বর্ণযুগ কেমন ছিল?
সার্ক ফোয়ারার সৌন্দর্য কেন নষ্ট হচ্ছে দিনকে দিন,
চিড়িয়াখানার লেকে শীতে অতিথি পাখি কেন আসে?
টিএসসির ভেতরে এখনও একটা গ্রিক ভাস্কর্য কেমন করে টিকে আছে?

অবসাদ

শ্যাওলা সরিয়ে তোমার মনটা দেখতে দেবে আমায়? এই যে শীত আসি আসি করছে তুমি কি তা দেখো না? ভুবন চিলের মতো আমারও একটা মন আছে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ঝিনুকের মতো শাদা আকাশে তা উড়তে চায়। তুমি তা জানো না। বহুদিন ধরে একটা নদী তোমাকে ভাসাতে চায়, তুমি ভাসো না। পৌষরাত আসে। ভেজা চাঁদ জাগে, তুমি তার সাথে জেগে থাকো। কিছু তারা তোমার খোঁপায় জড়াতে চায় কিন্তু অনুমতি পায় না। এই যে ময়না পোষার মতো বুকের ভেতর তুমি দুঃখ পুষে রাখো তাতে তোমার চোখ কি লুকাতে পারে কান্নার কুয়াশা? ঢের দিন হলো ভালোবেসে দেখলে কেমন স্যাঁতসেঁতে এ জীবন! কত নোনাধরা দেয়ালে সুখের ফটোফ্রেম শোভা পায়। ড্রইংরুমে অমিত-লাবণ্যের প্রেমের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিশ্লেষণ হয়। শশী ডাক্তার পরানের বউ কুসুমের মন নিয়ে কেন বিশ বছর খেলা করেছে তার জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসামি করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। অথচ আমার স্মৃতির কৌটো খুলে কেউ দেখে না। আমার বিরহে কেউ মোমবাতি জ্বালে না। কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা হয় না। কেউ জানে না কেন তুমি অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় সব ভালোবাসার আয়োজন ফেলে শীতকুয়াশায় মিশেছিলে?

ভালোবাসা বেচার বিজ্ঞাপন

ভালোবাসা বেচার এমন বিজ্ঞাপন আমি আগে কখনো দেখিনি।
মূল্য হিসেবে চাওয়া হয়েছে টাঙুয়ার হাওর, দিন সাতেকের বৃষ্টি আর কার্তিকের শেষ রাতের হিমে ভেজা চাঁদ।
এই শহরের দামি কোনো জিনিসই বিনিময়মূল্য হিসেবে দাবি করা হয়নি।
শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে কিনবে এমন কমলা রোদে মেলে দেওয়া ভালোবাসা;
যার বুকজুড়ে রয়েছে মৌরি ফুলের ঘ্রাণ তাকে রাখতে হবে তিতাসের জলের ওপর।
গোল বেগুনি টিপের ভেতর থাকতে হবে তার প্রকাশ;
পারদের মতো তারও থাকবে ওঠা-নামা।
কোনো দিন জ্যোৎস্না পোহাবে; কোনো দিন রাতে ঘুমোবে জলের বিছানায়।
কখনো তাকে দেখা যাবে জামদানির নকশায়;
কখনো তাকে পাওয়া যাবে প্রেমিকার তিল ঠোঁটের লজ্জায়।
এই নগরের নীল মেঘ কেবল তাকে দেখবে; কনে দেখা আলোয় সে ফুটবে।
স্যাঁতসেঁতে দিনে সে হবে মাঝ বিলের পদ্ম।
চারদিকে হবে ঝাড়বাতির আলোর রোশনাই।
ভালোবাসা বেচার এমন বিজ্ঞাপন আমি আগে কখনো দেখিনি।
এমন জলের দামে এমন জহরত কেউ বেচে নাকি আজকাল!
ভালোবাসা বুঝি তার কাছে জরির ফিতা, বাতাসে ওড়ায় সে ফিতা; ওড়ে তার আর্দ্র কালো চুল।

একটা বৃষ্টিদিনের জন্য

এমনতর প্রত্যাশিত বৃষ্টির দিনের জন্য মুখিয়ে থাকে জাম পাতারা;
অলস মেঘ জানে না চোখের ভেতর কেমন করে বৃষ্টি তোলে জল বুদবুদ।
তুমিও জানো না যে পানকৌড়ি তোমার চুলের রং চুরি করে জলে ডুব দিয়েছে
আসন্ন আষাঢ়ে সে তোমার দিঘিপাড়ে তুলবে তার নতুন ডেরা।
ঘন বৃষ্টির দিনে জরির মতো তোমার মুখজুড়ে কেবলই শ্যাওলা ঢেউয়ের আনাগোনা।
উদাসী মনের গহিনে হু হু করে উঠে আসে বন্য বাতাস।
রূপোর নূপুরের মতন একটানা বৃষ্টির বোল বাজে;
অন্দরবাড়ির দরদালান, খিলান, কার্নিশ ছাড়িয়ে তা সুদূরের মেঘরাজ্যের
জলপরিদের আমন্ত্রণ জানায়।
কেমনতরো দিন বলো বাম বুকে পাতা খড়ের বিছানায় শুয়ে শুনতে পাচ্ছি ঝরঝর
বৃষ্টি পড়ার শব্দ।
বৃষ্টির শব্দ আজকাল গভীর ঘুমের ভেতর তোমার মতন পা টিপে টিপে এসে
শিথানে দাঁড়ায়।
নাকের নথে তুমিও বৃষ্টির ফোঁটাকে কেমন করে বশ মানাও;
সে ফোঁটা দিব্যি তোমার নথের ওপর চুপটি করে বসে থাকে।
বৃষ্টি তোমার কাছ থেকে শিখে নেয় টিপটিপ করে ঝরে পড়বার মন্ত্র।

বিভ্রান্তির পঙ্‌ক্তিমালা

এই যে গাঢ় অন্ধকারের ভেতর যে পাললিক স্রোত নীহারিকার বুকে আছড়ে পড়ে সেখানে কোটি কোটি আলোর মিছিলে আমি দেখেছি তোমার কোরালের মতো মৃত চোখ। বয়স্ক পৃথিবীর বুকে তোমার নীলাভ ওড়না যে যৌবনের খবর এনেছিল সমুদ্রের ফেনার মতো তা বাষ্পীভূত হয়েছে। যে বালির যন্ত্রণা বুকে পুষে পুষে ঝিনুক মুক্তো ফলায় সে মুক্তো জানে না ঝিনুকের জঠর-বেদনা। চিত্রকরের চোখ আটকে থাকে ঝিনুকের অবয়বে আর তুমি বেনিয়ার মতো খুঁজে ফেরো মুক্তো। আমি অ্যালবাট্রোস পাখি হয়ে তোমার চোখের সমুদ্র ও ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করে দেখেছি সেখানে কোনো ছায়া নেই, জলজ মেঘ নেই, জ্বরের মতো উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় এমন ভালোবাসা নেই। হেক্টরের পর হেক্টর সাহারা মরুভূমির লু-হাওয়ায় আর লাভায় পোড়া জমিনে খুঁজেছি ভালোবাসার হারানো শিশি। যে শিশিতে লুকানো আতর আর পুরনো বনেদি ঘ্রাণ উবে গিয়েছিল চৈনিক যুগেরও আগে! তোমার চুলের অগ্রভাগে পোয়াতি নারীর পেটের মতো স্ফীত যে জল টিপটিপ গড়িয়ে পড়েছিল তা কি নীলনদবাহিত ছিল না? এই যে নিপুণ বিশ্বাসে অবিশ্বাসের খেলা খেলো তুমি প্রত্যহ একটি লাল রুমাল নাড়িয়ে; হেরেমের সৌন্দর্যের পাকে পাকে বাঁধো আমাকে, বাঁকা ভ্রুর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলো আমাকে। আমি নিতান্তই এক ফেরারি কয়েদি যে অজস্র সৌরবর্ষ তোমার ভালোবাসার শুনানির রায়ের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ।

হলুদ পাতা ঝরার পর

এখানে ঝরে পড়া দিন আসে মৃত হলুদ পাতার মতন,
অন্দরের খিলানে লেখা হয় ইতিহাস;
প্রাচীন দরজায় কড়া নেড়ে যায় কামিনীর ঘ্রাণ।
বিধবা নারীর মতন নিস্তরঙ্গ পুকুর জল,
যার ঢেউহীন ঘাটলায় একদা ছিল বারোয়ারি ভিড়;
চিতল মাছের কানকোয় জমা ছিল কিছু রূপকথার গল্প।
ছাতনাই নদীতে ডিঙি বেয়ে যে পুরুষ মাঝ রাতে এসেছিল নীল জ্যোৎস্নার খোঁজে;
তার বাবরি চুলে আশ্বিনের বাতাস ঢেউ খেলে,
প্রশস্ত ললাটে তার মাঘের হিম কুয়াশার পরত।
এ তল্লাটে মেঘ যুবতী নারীর মতো উদ্দাম,
রাজকন্যার বেশে খোঁপা করা মেঘ এসে দাঁড়ায় ইতিহাসের দরজায়।
চাঁপা ফুলের ঘ্রাণে ভরে ওঠে চারপাশ,
হলুদ পাতার ঝরে পড়া দিন শেষ হয়;
দেয়ালে দেয়ালে, অলিন্দে, থামে, টানা বারান্দায় জ্বলে ওঠে শেজবাতি।

আশার পদধ্বনি শুনি

একবার শুনিয়ে যাও বৃষ্টির শব্দ,
রোদ ফুরোবার আগে;
চোখের ভেতরে যে বিকেল তুমি সাথে করে এনেছিলে,
থুতনির তিল গড়িয়ে তা মেঘের সাথে কবেই মিশেছে।
এখানে যারা মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে;
আধফোটা ছাতিমের মতন যাদের জীবনের
সব সুঘ্রাণ গেছে উবে,
যৌবন গেছে তিতাসের মতন শুকিয়ে;
তুমি তাদের জীবনের ঢাল বেয়ে নামো বৃষ্টির ঢল হয়ে।
বাতাসে হিল্লোল তোলো, পাতায় পাতায় কাঁপুনি তুলে নোনা শিহরণে ভেজাও তৃষ্ণিত উঠোন।
ভেজা শিরীষের পাতারা জানুক বুকের ভেতর পোষা কবুতর,
শূন্য ঘর রেখে সেও একদিন বিরান চরে উড়াল দেয়।
পূর্ণতাদের ছুঁতে ছুঁতে শূন্যতারা বড়ো হয়,
এখানে যাদের মনে জমেছে লবণের চর;
যারা স্বপ্নকে বেচে এসেছে কুশলীপাশার হাটে,
বাঁচবে না বলে ছেড়েছে ভিটেমাটি।
তুমি তাদেরকে বলে দাও, সরভাঙা জলের নিচে আজও মাছেরা খেলে যুবতীর অনায়াস ভঙ্গিমায়।
এখনও প্রেমিকার বুকে ভোর হয়; পুবের আকাশে ধানি রোদ ওঠে।

ভুল বোঝার আগেই...

এই যে তোমাকে বুঝতে না দিয়ে তোমার মন পড়ার বিদ্যা আমি রপ্ত করেছি গোপনে,
তুমি কী দ্যাখো নাই আমার ভালোবাসা কেমন নদীর জলের মতো পাকে পাকে
বাঁধে তোমারে।
বিশ্বাস করো নাই আমি তোমার জন্য মরতে পারি!
তুচ্ছ জীবনের মায়া ছাড়তে পারি অনায়াসে।
ত্রিশ বছরের সাধের জীবন তোমার হাতের ডগায় তুলে দিতে পারি এক বাক্যে।
অথচ তুমি জানো না কেমন করে ফোটে নিশি ফুল?
কেমন করে তোমার ঠোঁটে লেগে থাকে গোলাপজল কিংবা সুগন্ধি আতর?
এই যে উড়ন্ত বাতাসে ডিঙি নৌকার মতো তোমার ভ্রু নাচে,
তন্দ্রাহারা তরুণীর মতো নদী জাগে;
অথচ ঘুমের ভিতর লেইস-ফিতা দিয়া তোমারে যে কিনেছিল সে তোমারে পায় না।
কতবার আমি বাজি ধরছি তোমার বুকের ভরা গাঙের ভালোবাসা নিয়া,
ভেবেছি সে গাঙের জলে আমার অনির্শেষ অধিকার।
দেখেছি তোমার গতরে পাহাড়ি নাগেশ্বরের ঘ্রাণ,
নাম না জানা প্রেমের উল্কি আঁকা তোমার নাভিমূলে।
অথচ কেমন করে আমি দাবি করেছি তুমি আমার,
কী করুণভাবে জেনেছি ধান তাবিজে সব হয় না।
স্মৃতি দিয়ে রক্ষা হয় না ভালোবাসার গোলা।
তবুও তোমার-ই জন্য একটা জীবন অকারণে নষ্ট করা,
অনেকগুলি প্রেমকে অকারণে কষ্ট দেওয়া।
অনেক প্রতিশ্রুতি অকারণে ভেঙে দেওয়া;
অনেক আলিঙ্গনে কাছে এসে সরে যাওয়া।
তুমি বোঝ নাই আমাকে,
অথচ ভুল বোঝার আগেই আমি বুঝেছি তোমাকে।

জিতে যাব একদিন

চিঠির মতন যদি লিখতে ভালোবাসি,
মিথ্যে হলেও আমি তাতেই মুগ্ধ হতাম।
কত মানুষই তো প্রতিদিন কতভাবে ঠকায়;
তুমি না হয় ভালোবাসি—এই মিথ্যে আশ্বাসে আমাকে আর কটা দিন ঘোরের ভেতরে রাখতে।
কতজন দলিল করে, সাক্ষী-সাবুদ ডেকে, মামলা করে হয়রানি করে;
কোর্ট-কাচারি করে ফেরত চায় লাভ-লোকসান।
তোমার অনভ্যাসে লেখা ভালোবাসার কথায় আমার হতো না কোনো লাভ,
লোকসান গুনতে গুনতে আমার যা হয়রানি হতো তা আমি না হয় মেনেই নিতাম
তবুও নকল দলিল করে তোমার কাছে ভালোবাসার দাবি তুলতাম না।
আমি মুগ্ধ বলেই,
আমার প্রতি তোমার অমনোযোগিতা বেশি।
তোমার ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেয়ে পাঁড় মাতাল আজ দিব্যি সংসারী;
অথচ তুমি সেতারের তিন তারের মতন পাশাপাশি থেকেও ভয়ানক একা।
আমার দিক থেকে তোমার জন্য নেই কোনো ভিটেমাটি ছেড়ে আসার মতন টান।
যা যাবার আমার গেছে,
আমি কেবল ঘোরের ভেতর খুঁজেছি শাদা-কালো ফিতেয় বাঁধা বেণী আর ডজন ডজন লাল রেশমির চুড়ি।
আলতার আলপনা আঁকা পা, জরি রাঙানো গাল।
ঠকে ঠকে ভেবেছি এভাবে ভালোবাসা হারিয়ে তোমার কাছে জিতে যাব একদিন।

বিন্দুতে রেখায়িত সিন্ধুর দ্যোতনা তুমি

চিরকেলে অলস দুপুর তোমার ছড়ানো চুলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে;
নেহায়েতই ঘরে আলো জ্বালতে হবে বলে দরজার চৌকাঠ ছেড়ে সন্ধেকে উঠতে হয়,
তা না হলে ও অন্তত আরও খানিকক্ষণ তোমার আঁচল ধরে পড়ে রইত।
একটা বেলজিয়ামের আয়নারও অপেক্ষার তর সয় না;
সারা দিনজুড়ে সে তোমার প্রতিবিম্ব রচনায় উন্মুখ থাকে।
যে সূর্যমুখী কটা দিন ধরে অফোটা হয়ে ঝুলছিল বারান্দার টবে,
সেও কাল সকালবেলা তোমাকে দেখে না হেসে পারেনি।
নিদারুণ দাবদাহে তেতেপোড়া যে রোদ তোমার আটঘাট বাঁধা শরীরে এসে মোষের মতন হুমড়ি খেয়ে পড়ে;
তাকেও দেখেছি তোমার নাভির বৃন্তে শ্যাওলা পুকুরের জল হয়ে থিতু হতে।

জলগদ্য : ০১

এই ছেঁড়া ছেঁড়া বৃষ্টির দিন ভালো লাগে। শ্যাওলায় ডোবা পুকুর, তার নিস্তরঙ্গ পারে গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার ওপর বৃষ্টির বোল ভেজা বিকেলের নৈঃশব্দ্যকে মুখর করে তোলে। জমানো ছুটি খুচরো পয়সার মতন ফুরোতে থাকে। ঝমঝম বৃষ্টি মাঝ দুপুরকে প্রেম হারানো প্রেমিকার বুকের মতন কেমন ভারী করে তোলে। দূরে জলা-জঙ্গলে কলকল বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ার শব্দ দুকানে নূপুরের ধ্বনির তালে বাজে। নদীর ঘোলা জলের মোচড়ে বুকের ভেতরের পার ভূমিধসের মতন কেবলই ভাঙতে থাকে। জলোস্নাত এ জনপদ শামুকের খোলের মতন নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে। বৃষ্টির ওপর তাদের ভাষার ভার চাপিয়ে তারা যেন অলস তন্দ্রার দিন বেছে নিয়েছে এই বরিষণে।

জলগদ্য : ০২

এ জনপদের প্রাত্যহিক জীবন জলকাদায় মাখামাখি। পা ডোবা জল, হাঁটুজল, কোমরজল, বুকজল, এমনকি মাথা সমান জলে এরা ভেলা ভাসায়। পানাপুকুরের কোল ঘেঁষে, মুলিবাঁশের ঝাড় ছাড়িয়ে, ছাতিমতলার নিচ দিয়ে পায়ে হাঁটা যে পথ চলে গেছে হেলুচ্ছার হাটের দিকে, সে পথও আজ জনবিরল। মেঘের আঁড়ে গুঁজে রাখা জল সারা দিন ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের চোখের জলের মতন ঝরছে। পেঁপে পাতার ফাঁক গলিয়ে টুপটাপ ঝরে পড়া বৃষ্টির জল বুকের ভেতর চুড়ির শব্দে বেজে চলেছে। হাঁড়িমুখো মেঘ ছুটির শেষ কটি দিন কেঁদে-কেটেই কাটাচ্ছে। একটা অপরিচিত ঠিকানায়, অদেখা একটি মুখের সন্ধানে জলমগ্ন এ দেশে আসা। ছেদহীন জলরোল সময়কেও যেন জলদড়িতে বেঁধে ফেলেছে। বাদল এখানে নতুন জামাইয়ের মতন মুখে রুমাল এঁটে নববধূর জন্য অপেক্ষা করে না। জলকন্যাকে বরণের নেই আলাদা প্রস্তুতি। যাঁকে খুঁজতে জলের এ দেশে এসেছি ছুটি ফুরোবার আগে তাঁর জলমুখের দেখা পাব তো...?

নির্মাণের নেপথ্যের অনুভব

শব্দ ছেনেছুনে প্রেমের ভ্রূণ তৈরিতে মনোযোগী কলমশ্রমিক যারা;
তাঁদের আত্মদানের কথা ভাতশালিকের ডানায় লেখা থাকে না।
কলঙ্কিত চাঁদও এক সময় টিপ হয়,
যমুনার জল হয়ে ওঠে রাধার শরীর।
মাতাল কেমন করে মানবিক হয়;
রাতের আনন্দদায়িনীর রজনিগন্ধা হয়ে ওঠার কান্না কেউ কোনো দিন দেখে না।
কী নিবিষ্ট ধ্যানে এইসব শব্দছবি,
কালো সুতোয় ভাষার শাড়িতে ফুলবন্দি করেন কবি।
হাস্নাহেনারও যে দুঃখ থাকে,
নিন্দিত প্রেমও কারও কারও সুখের চাবি হয়ে ওঠে;
ফেরারি আসামির কারাবন্দি জীবনে আবছায়া জলমুখ রোদদিনের অপেক্ষা বাড়ায়।
লাশঘরে যে লাশটির তন্ত্রী, যকৃত মৃত্যুরহস্যকে কালো নদী করে;
একজন শব্দযোদ্ধা সে নদীটিকেই বেলা বোসের চোখের পার করে তোলেন।

বাদামি বার্তা

বাইরে শান্তির ছিমছাম সকাল, বুকের ভেতর কেবল একখণ্ড কাশ্মীর।
শাদা শাদা বরফের চাঁই নিমেষেই কেমন ছোপ ছোপ রক্তের পাহাড় হয়ে যায়;
তবে কি বিশ্ব আজ জুয়াড়িদের হাতের তালুতে বন্দি বায়ান্ন তাস।
শিক কাবাবের মতন পোড়া পৃথিবীর মাংসের তাল তারা খুবলে খুবলে খায়;
সাঁঝরাত কিংবা গাঢ়তর রাতে,
ব্যথা থেকে আরও তীব্রতর ব্যথায়—
বয়স্ক পৃথিবীর যখন ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়,
তখন লজ্জায় নত হয় না কারও চিবুক।
অথচ এখানে এর আশপাশের সর্বত্র বাঁশপাতার মতন চিকন রোদ ছড়িয়ে পড়ত প্রতিদিন।
পিচঢালা রাস্তায় টায়ারের ঘর্ষণের গন্ধ লেপটে থাকত;
মিউনিসিপ্যালের কলের জল ধরার জন্য জমা হতো অগণিত লোক।
দিনশেষে রোদে পোড়া পৃথিবীর ছায়াটা জানালার কার্নিশ গলে বারবারান্দায়
অশীতিপর রবীন্দ্রনাথের মতো থিতু হয়ে বসত।

ফেরার কথা ছিল

দিন শেষে প্রেম কিংবা প্রিয়তমাষুর কাছেই ফেরার কথা ছিল।
মাঠভরতি জোছনারা, যারা আস্ত একটা রাত কাটিয়ে কাশবনের শাদা কাশফুলের সাথে মিশেছে, মিলেছে;
তাদের অনেকের পাপড়ি যুদ্ধে ফেরা সৈনিকের মতন ক্ষত-বিক্ষত আজ।
লাল রক্তে ভিজেছে তাদের অঢেল যৌবন অথবা যৌবনের দিন।
যে বারবিলাসিনী রাতভর মদমত্ত পুরুষকে দিয়েছে মোগলাই কারুকাজ খচিত দেহ,
অন্ধ ষাঁড়ের মতন বেসামাল বন্য লালসার লালায় সে চুকিয়েছে শরীরের দাম।
তার জ্বরে পোড়া আগুনের কপাল গলে ঘামের ক্লেদ ভোরের বাতাসে ছড়িয়েছে লোবানের গন্ধ।
উপুড় হওয়া রাজপথ, ফাঁসির দড়ির মতন ফুটপাত, উবু ল্যাম্পপোস্টের ঘোলা আলো যা একজন জাদুকরের কাছ থেকে কিনেছিল এক আগন্তুক প্রেমিক।
তখন সে সুগন্ধি প্রেমের বিকিকিনিতে একেবারেই আনাড়ি যুবক,
তার কাছে নতুন প্রেমিকার মতন অচেনা শহর—
ভেবেছিল সে বাঁশির, বীণার, বাণীর প্রেমে নেশাগ্রস্ত হবে নগরের সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ, কিন্তু তারা,
শহরের নদী, আধভাঙা চাঁদ, হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে নামা বৃষ্টি কিংবা বিকেলে উত্তাপ জুড়িয়ে যাওয়া সূর্যের কাছে আর ফেরেনি।
প্রেম ছেড়ে কী করে পানশালাকে ভালোবাসল তারা!
অথচ প্রেমে বা প্রেমময় শব্দশস্যের ভূমিজ জীবনে তাদের ফেরার কথা ছিল।

প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০১

তুই, একলা ঘরে ঘুম ভাঙা সকালে রেশমি চুড়ির টুং টাং শব্দ হবি,
এমনটা ভেবে ভেবেই আমার বড় হয়ে ওঠা।
অগলছাড়া শৈশবে তোকে ভেবে সানাইয়ের সুরের মানে খুঁজেছি।
চার বেহারার পালকির ভেতর ঘোমটা টানা কাউকে দেখে;
যখন দাঁড়িয়েছি দুধকুমার নদীর পারে,
দেখেছি তার জলে তোরই মুখের ছবি।
তোর এক্কা-দোক্কা খেলার সময় দাগে পা পড়লেও সে কথা আমি কাউকে বলিনি।
চুপ করে উঠে গেছি অন্য কোথাও,
বরই পাড়তে গিয়ে তোর কেটে যাওয়া রক্তঝরা পিঠে,
আমি যে দূর্বা ঘাসের রস লাগিয়ে দিয়েছিলাম এ কথা
পৃথিবীর আর কেউ জানে না রে।
অনেক দিন পর কাটা দাগ শুকিয়েছে কি না দেখতে চাইলে তোর মুখখানা কেমন রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল।
আমি বুঝেছিলাম তুই বড়ো হচ্ছিস।
একটা মুখের ধ্যান করতে করতে আমি হারিয়েছি শৈশব, কৈশোর।
যদিও যৌবন আজও কেমন গোলাপি রঙে রাঙা;
তোরও কি এমন দশা?
অকারণে ভিজিয়েছিস বালিশের তুলো,
আমার অপেক্ষায় ছেড়েছিস শরৎচন্দ্র;
বুকের ভেতর পুষেছিস হরিণঘাটা নদী।
তোকে বলিনি তোর তোয়ালেতে মুখ ডুবিয়ে কতবার নিয়েছি তোরই ঘ্রাণ,
তোর ব্যবহৃত সুগন্ধি সাবানের গন্ধে ভুলেছি কতটা দুঃখ, তাপ।
একজোড়া চোখ দেখতে দেখতে আমার এই পৃথিবী দেখা।
একজোড়া ঠোঁটের ভাষার গম্বুজ ছুঁতে গিয়েই মেঘ হওয়া।

প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০২

তোকে ভালোবাসি এ কথাটা বলতেই রেশমি রোদেরা আমায় ঘিরে ধরে;
অলস দুপুরগুলো ফেলে আসা এক একটা দিনের গল্পকে মনে করিয়ে দেয়।
তখন কলেজে যাবার বয়স,
সারা দিন মনের ভেতর ঝড়ো হাওয়ার হু হু শব্দ।
তোকে দেখার তীব্র ছটফটানি;
বুকের ভেতর হামকুড়া নদীর জলের মোচড়।
কী সাদা-কালো দিন,
অথচ কত রঙিন খোয়াবের ভেলায় চড়ে কেটেছে তা।
সুগন্ধার হাটে বেলোয়ারির চুড়ি কিনে ফেরা,
তোর দেখা পাব ভেবে কোমরডাঙার মাঠে ঝাঁ রোদ্দুরে বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা।
কোনো এক বিয়েবাড়িতে হাঁসুলি গলায়, লালপেড়ে শাড়িতে তোকে দেখে নববধূ ভেবে স্মৃতিভ্রম হয়েছিল কি?
তখন লুকিয়ে সিনেমা দেখার বয়স,
বুকের ভেতর প্রেম কেবল সরিষার ফুলের মধুর মতো জমাট বাঁধতে শুরু করেছে;
তখন চুনকুড়ি নদীতে তোকে নিয়ে সাঁতরেছি একসাথে।
ভেজা সালোয়ারে, কামিজে নদীর রেখার মতন তোর শরীরের বাঁক,
আমাকে কখনো ভাসিয়েছে, কখনো ডুবিয়েছে।
তোকে পাবার, জানার, বোঝার—
এপারের-ওপারের সীমানাজুড়ে কেবলই জাল ও জলের রহস্যভেদ।

প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০৩

সেদিন তোড়েজোড়ে বৃষ্টি ছিল,
শাড়ির আঁচল উড়িয়ে মেঘ এসেছিল।
আলো ছড়িয়ে তুই আসবি এমনটা ভেবে ভেবে সারা দিন অন্ধের মতন অপেক্ষায় রইলাম।
নাওয়া-খাওয়ার ঘরে খিড়কি তুলে ঢের দিন আগেই আকাশে আকাশে তোকে ভালোবাসার কথাই লিখেছিলাম।
তখন আমি যুবক,
মধ্যদুপুরে অঢেল সময় হাতে,
ঘরজুড়ে পাতাপড়া নিঃশব্দতায় কেবল কবিতার বইয়ের পৃষ্ঠা উলটানোর খসখসে আওয়াজ।
তোকে কবিতার চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম এ কথা কেমন করে যেন কবিতারাও এক সময় জেনে যায়।
তারপর কবিতা বিধবা নারীর নাকফুলের মতন আমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিল একদিন;
কিন্তু বিনিময়ে তোকে দিয়ে গেল না।
তখন মেঘলা দিনগুলো তোর মতন চুপিসারে আসত,
ঝরঝর বাদল তোর কথাই বলে যেত;
এমন এক একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল গেছে,
যখন আমার যুবক বয়সটি শুধুই ভিজেছে।
কেমন করে তোকে বলি,
তুই ছাড়া একাকী আমি নিঃসঙ্গ বারো মাস।
এক কানাকড়ি বিদ্যে আমার ঢোকে নাকো মাথায়,
সারাক্ষণই তুই অনুরণন তুলিস তোরই বলা কথায়।
তখন আমি যুবক, তোর ভালোবাসায় বাঁচি;
বুঝি নাই ভালোবাসা হয় যে সর্বনাশী।
তোর জন্য বাস্তুভিটে ছাড়লাম এক সময়,
দেরিতে দেরিতে কেমন যেন জীবনটাই ছেড়ে এলাম।

প্রগাঢ় প্রেমের কবিতা : ০৪

জ্বরের মতো থেমে থেমে তোর প্রেম আসে,
বেঘোরে রাখে আমায় সারাক্ষণ।
ঘাম দিয়ে যখন ছাড়ে সে জ্বর আমার সারা দেহে তখন লক্ষিন্দরের বিষের দহন।
চড়ুইভাতি খেলতে খেলতে যে প্রেম জন্মেছিল;
ঝড়, জল, কাদায় আঁতুড়ঘরে নিউমোনিয়ার সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে ছিল যে প্রেম,
সে প্রেম পাহাড়ি নিমের মতো আমার রক্তকোষকে তেতো করেছিল।
তাই, ভূমিষ্ঠ হবার পর পারু মাসি বলেছিল,
'এ ছেলে শিবের মতো বিষ পান করলেও মরবে না।'
গোবরাগাবরা পারু মাসি কেন এ কথা বলেছিল তার কোনো ব্যাখ্যা কেউ আমাকে দেয়নি, লোকান্তরিত পারু মাসিও তা বলে যায়নি।
আমি বিষ খেয়ে বিষ হজম করে বেঁচে আছি।
তোর প্রেম আমাকে এতটাই আত্মবিশ্বাসী করে তোলে,
আমি মরণের সঙ্গে লড়তে লড়তে কেমন করে যেন বেঁচে যাই।
দুর্ভিক্ষে বাঁচি, খরায় বাঁচি, জলোচ্ছ্বাসে বাঁচি।
তোর ঠোঁটে ভেজা ঘামের স্বাদ নিতে গিয়ে গরম খুনতির যে ছ্যাকায় তুই
পুড়িয়েছিলি আমার হাত;
আসলে সেদিন হাত পোড়েনি, পুড়েছিল আমার বুক।
পরে একদিন বুঝেছিলাম মরণের মতো ঘুমের ভেতর তোর কোমল হাত আমার বুক হাতড়ে খুঁজেছিল সে পোড়া দাগ।
সাতপাতা চুরির মতো আমার প্রেম চুরি করে তুই পালালি কবে?
তুই খুঁজবি ভেবে রং-বেরঙের ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলো আজও মাটির গর্তে তেমনি পুঁতে রেখেছি।
চড়ুইভাতি, সাতপাতা লুকানো, ভাঙা চুড়ি খোঁজা প্রেমের উত্তরাধিকার তোর দোগাছি বেণীতে বেঁচে থাকুক।

আষাঢ়ের কসম

এই আষাঢ়ের বৃষ্টির কসম,
তোমার কাছে প্রেমের দাবি নিয়ে আর আসব না,
কতজন পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য হালখাতা করে;
আমি পাওনা ভালোবাসা ফেরত পাবার জন্য কদম নিয়ে দাঁড়াব না।
ত্রিশ দিনের আষাঢ়ের একটি দিনও চাইব না।
এই ভেজা মেঘের কসম,
ভালোবাসা খেলাপির জন্য আমি কোনো শমন পাঠাব না।
অনেক দিন বাদে দেখা হলেও আষাঢ় মাসের কথা তুলব না।
কেউ যদি বলে,
বৃষ্টিতে ভেজো না কেন?
না ভেজার ওয়াদার কথা বলব না।
ভুনা খিচুড়ি, বেগুন পোড়া যে খেতে চায় খাক না,
আমি ওসবে লোলুপ চোখে তাকাব না।
আমার হাঁড়ি শূন্য থাকুক,
তুমুল বৃষ্টি নামুক না!
এই বাদলা দিনের কসম,
আমি প্রেম ফেরতের জন্য হরতাল ডাকব না,
আমি জানি বিয়ের রেজিস্ট্রি কাগজ থাকে,
প্রেমের থাকে না।
যে প্রমাণাদি ঠোঁটে আছে তা কারও দেখাব না।
ভালোবাসা যার খোয়া গেছে,
নালিশ করে তার কীই বা হবে?
হারানো প্রেম ফেরেও যদি,
সেই আষাঢ় ফিরবে না।

ভালোবাসার কড়চা

নোনা ঘাম চেখে দেখার জন্য একজন মানুষ না লাগলেও জ্বরে থার্মোমিটারের পারদ
কতটা উপরে ওঠে তা দেখার জন্য কেউ একজন থাকতে হয়।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল তারপর সন্ধে,
সন্ধে যখন রাতের বুকের ভেতর ঢুকে পড়ে;
তখন বুকের ভেতরে ছাতিম ফুল ফোটার কথা কাউকে বলতে হয়।
অনেক দিনের জমানো অভিমান,
যা বৃষ্টির কাছে দিতে গিয়ে প্রত্যাখিত হতে হয়;
অনেক বছর বয়ে বেড়ানো কষ্ট,
যা নদীও ফিরিয়ে দেয়,
তা গ্রহণ করবার জন্য, গর্ভবীজের মতো ধারণ করবার জন্য কাউকে দরকার হয়।
পিপাসায় জল এগিয়ে কেউ না দিক,
তুমুল ঝড়ে বারবারান্দায় রাখা হুইল চেয়ারটা না তুলুক;
শক্ত করে দরজার খিল না তুলে দিক,
ভেজা চুলগুলো গামছা দিয়ে না মুছুক,
ঘুঘুর বুকের মতন আর্দ্রতা নাই বা দিল,
তবুও গাঢ় অচেতন থেকে চেতনে ফিরে এলে কেউ একজন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলার
জন্য লাগে,
'তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও, কখনো যেতে পারো না।'

ব্যবচ্ছেদ

বেদনা তোমাকে বলছি,
অষ্টপ্রহর কেন ঘোরাঘুরি করো মৌমাছির মতন?
মধু সঞ্চয় না করে, করো তিতা রসের কারবার।
মন তোমাকে চায় না;
অথচ তারই ফাঁকফোকর দিয়ে হাওয়ার মতো ঢুকে পড়ো।
বিষের দহনে নীল করো ভালোবাসার তালুক।
খোয়া উঠে যাওয়া রাজপথ জানুক,
বুকের মাংস কেউ খাবলে তুলে নিলে;
যন্ত্রণার রং লাল হয় কেমন?
যন্ত্রণা তোমাকে বলছি,
খোরশোলা মাছের মতন কেন সারাক্ষণ সাঁতার কাটো অনুভূতির নদীজুড়ে?
কে তোমাকে চেয়েছে প্রার্থনায়?
আলসে রোদে মাদুর বিছিয়ে বসতে বলেছে কে?
অনাদরে কে তোমার কাছে;
তেতেপুড়ে এসে চেয়েছে এক বাসর ভালোবাসা?
ওপেন হার্ট সার্জারি করা মুমূর্ষু প্রেমিক জানুক,
একবার বুকের পাঁজর খুললে,
তুমি তাকে কতটা বিরহে ডোবাও।
তাতানো লোহার ছ্যাকার মতন কালশিটে দাগ রেখে যাও তার বুকে।
কষ্ট তোমাকে বলছি,
আষাঢ়ের মতন মেঘ করে হাপুস-হুপুস কান্না ছাড়া কি তোমার আর কোনো কাজ নেই?
কে তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে চোখের আঙিনায়?
আটঘাট বেঁধে তুমি কত আর পোড়াবে কপাল?
অপরিপক্ব প্রেম জানুক, জানুক অপরিণত ভালোবাসারা—
বৃন্তচ্যুত ফুলের মতন প্রিয়া খসে পড়লে;
তুমি প্রেমিককে কতটা বরফ করে তোলো।
আতিবিতি করে মনের দরদালানে আসা-যাওয়া,
কিন্তু জন্মদাগের মতন কীভাবে হয়ে ওঠো স্থায়ী?

আমার বিশেষ কোনো দুঃখ নেই

অনেকে জানতে চায় আমার বিশেষ কোনো দুঃখ আছে কি না?
প্রেম হারানোর মতো কোনো বেদনা আছে কি না?
প্রেম হারালেই কি মানুষ সব হারায়?
খুব ছোটবেলা বুক পকেটে গুঁড়ো লজেন্স রেখে দিতাম;
অসাবধানে তার দু-একটা হারিয়ে গেলে মনে হতো এর চেয়ে বেশি কষ্ট বোধহয় জীবনে নেই।
অনেককাল আগে আট আনা পয়সায় দুটো আইসক্রিম হতো,
তখন হাতে করে অথবা বুকে জড়িয়ে ধরে বই নিয়ে স্কুলে যাওয়ার বয়স।
বইগুলো বাঁশকাগজে মলাট দেওয়া থাকত, পৃষ্ঠার মধ্যে থাকত ময়ূরের ভাঙা পাখনা।
প্রতিদিন কতবার যে পাতা উলটে দেখতাম পাখনা থেকে নতুন কোনো পালক গজিয়েছে কি না;
মাথায় দেওয়া সরিষার তেল ঘষে ঘষে সেই পাখনায় লাগাতাম যেন তাড়াতাড়ি পালক গজায়।
সেই সময় আট আনা পয়সা প্যান্টের পকেট গলিয়ে হারিয়ে গেলে বুকটা ব্যথায় টনটন করত।
সারা দিন আইসক্রিম খেতে পারব না, এটা ছিল ভাত না খাওয়া কষ্টের চেয়েও বেশি।
কোনো বন্ধু ময়ূরের পাখনা চুরি করলে অভিমানে তার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিতাম।
একটা ভিউকার্ড হারিয়ে গেলে এক সপ্তাহ মন খারাপ থাকত
তখন স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলার যুগ।
ভালো অ্যালবাম কেনার সামর্থ্য তখনও অনেক পরিবারের হয়নি,
কোনো দিন কোনো কারণে ছবি তোলা হলে,
ছবিগুলো মায়ের সবচেয়ে ভালো শাড়িটির ভাঁজে রেখে দিতাম।
অনেক দিন ওভাবে ছবি রাখায় ছবির কোনো কোনো অংশ ঘোলা হয়ে যেত।
সে ছবি দেখেও কষ্ট পেয়েছি কত,
আবার কবে যাব স্টুডিওতে, আর কি এত ভালো ছবি কোনো দিন তোলা হবে?
সত্যি বলছি প্রেম যেদিন ছেড়ে গেছে আমায় সেদিন
সারা শহরে বৃষ্টি ছিল;
কেবল আমার চোখ দুটি ছিল খটখটে শুকনা।
কিন্তু আবাক করা কাণ্ড
মাকে যেদিন কবরে শুইয়ে দিলাম, সেদিন সারা শহরজুড়ে ঝকঝকে রোদ্দুর;
অথচ সেদিন আমার চোখে নেমেছিল বৃষ্টির ঢল।

কী নোনা বৃষ্টি! কী করুণ সে কান্না! কী বিষণ্ন বিষাদে মোড়ানো সেই ক্ষণ!
অনেকে ভাবে কীভাবে আমি হাঁটি, চলি, কথা বলি, চাকরি করি, বাজার করি, ছেলের স্কুলের মাইনে দিই; কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করি বা টিভি সিরিয়ালে রাখি চোখ?
আরও কত কেজো কাজ করি...
কেউ আড়ালে বলে, আরে মশাই বুঝলেন না ওসব দুঃখের ভান।
দুঃখের ভান কেমন করে করতে হয় আমি জানি না।
আমি সুখের ভান করি,
তাই চেহারায় একটা সুখ সুখ ভাব সারাক্ষণ কেমন মেকআপের মতো লেগে থাকে।
জীবনকে ক্ষয় রোগীর মতন বয়ে বেড়ানো ছাড়া
আমার বিশেষ কোনো দুঃখ নেই।

অন্য জনমে

তোমাকে একটা সুইচোরা পাখি দিলাম,
তুমি বললে ওকে পোষ মানাবে;
আদরে আদরে রাখবে সারাক্ষণ।
কিছুদিন পরে দেখি সত্যি পাখিটা তোমার আঁচল ছেড়ে যায় না কোথাও,
অথচ নীলাভ আকাশ এক সময় ওর খুব প্রিয় ছিল।
জলের কিনারায় ঘুরে-ফিরে ও চিংড়ি শিকার করত,
রাত হলে ঘুমোত পাহাড়ের খাঁজে খড়ের বাসায়।
বালুতীরে হেঁটে হেঁটে বেড়াত সারা দিন।
তুমি বলেছিলে কচ্ছপের কথা,
তোমাকে একটা সোনালি কচ্ছপ দিলাম।
ওকে খুঁজতে গিয়ে একটা গোখরো সাপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমায়।
লবণ জলে কচ্ছপটা সাঁতরে বেড়াত,
ডুবত আর ভাসত;
ওর পিঠের খোলে ভেজা রোদ্দুর,
সেখানে শামুক হেঁটে বেড়াত কত,
এখন তোমার বাথটাবের জলে কী দিব্যি ও সাঁতার কাটে;
তোমার আশকারায় হেঁটে বেড়ায় সারা বাড়ি।
একটা কাপড়ের তৈরি পুরুষ পুতুল চেয়েছিলে,
অনেক দেরি করে;
কোনো এক আলো নিভে যাওয়া ম্লান বিকেলে
রঙিন কাপড়ের তৈরি একখানা পুরুষ পুতুল নিয়ে দাঁড়ালাম তোমার সামনে—
আমাকে দেখলেই না যেন তুমি,
পুতুলটি হাতে ধরে;
ডাগর চোখে তার দিকে চেয়ে
টোল পড়া হাসি হেসে বললে,
আমার 'প্রাণের রাজা' এতদিন পরে কেন এলে?
এ কথা শুনে কাপড়ের পুতুলও যুবকের মতো নড়ে ওঠে।
তার লালচে গালের ভাঁজে তোমার অজস্র চম্বুনের ছাপ।
আমি ততক্ষণে মনে মনে স্রষ্টাকে বলতে শুরু করেছি—
আর জনমে রঙিন পুরুষ পুতুল কোরো আমায়।
লালচে গাল না হোক,
আদরের আর্দ্রতা না থাক;
কারও 'প্রাণের রাজা' কোরো।

লুটেরা

কড়ির মতো যে ভালোবাসা একটু একটু করে জমিয়ে;
তোমাকে দেব ভেবে রেখে দিয়েছিলাম এতদিন,
তা হঠাৎই লুট হয়ে গেল।
আমার অজ্ঞাতস্বরে মাটির ঘর সিঁদ কেটে,
জীবনভর তোমাকে লেখা প্রেমের আঁকর চিঠিগুলোও একদিন চুরি হলো।
বুক কাটলে রক্তারক্তি ব্যাপার হবে ভেবে লুটেরা হৃদয়টাকে রেখে গেল।
মন নিয়ে ডাকাতি ওরা করেনি,
তবে জুয়া খেলেছে কতবার
জুয়াড়িরা ভেবেছিল মনটাকে বাগে পেলে ভালো দরদাম পাবে;
কিন্তু দেখো, ওরা বুঝতেই পারেনি মনটাকে তুমি কবেই কত দামে কিনে রেখেছ।
তুমি অফোটা গোলাপ দিয়ে যা পেয়েছ,
সহস্রাধিক দিরহামেও ওদের তা মেলেনি।
ওরা আমার কাছে দামি কিছু চাইতেই,
আমি ওদের প্রেম দেবার প্রস্তাব দিলাম;
বলল, ওসব ওদের কাছে কানাকড়িও দাম নেই।
প্রেমের কারবার ওরা অনেক আগেই ছেড়েছে;
প্রেম এখন আর খাঁটি নেই,
যা তোমাকে দিয়েছি, সে এঁটো জিনিস আবার তাদেরকে কেন দেওয়া?
ওরা বেছে বেছে আমার চোখটাই নিল,
আমাকে অন্ধকারে ছুড়ে বলল, আমার চোখটাই নাকি ওদের কাছে বেশি মূল্যবান।
যা দিয়ে এতদিন তোমাকে দেখেছি;
আয়নার মতো যাতে তোমার মুখাবয়ব অঙ্কিত,
তা এত দামি ছিল বুঝিনি।
অন্ধকারে এখন তোমাকে খুঁজি,
না দেখার চেয়ে বেশি দেখি।

ওয়াদা করিনি তো...

আলগা চুল পরিপাটি করে বেঁধে,
তাতে সুগন্ধি জবাকুসুম তেল মেখে আসতে হবে
এমন করে কাউকে তো কিছু বলিনি আমি কোনো দিন।
আমার মন পুড়ে খাক হলে,
তাতে কার বা কী যায় আসে?
আমার জন্য কার বলো তো চিড়চিড় করে ফেটেছে হৃদয়?
নানা কিসিমের চুড়ি, ঠোঁটপালিশ, আলতায় সাজবার জন্য আমি তো কাউকে দিব্যি দিইনি।
আমি তো কাউকে বলিনি কখনো কাতান পরো,
চুয়া-চন্দনে রাঙাও গতর;
আমার জন্য পাড়াকুঁদুলি হও।
হাটবারে ওঠা পোড়াদহের নকশি আঁকা লালপাড়ের শাড়িই আমার পছন্দ।
চিরকেলে আমি মন্দতেই খুশি হই;
আমি এমনই,
ভালোতে আমার ভালো লাগে না।
ওয়াদা তো দিইনি কারও কাছে,
চিত্তচোর তো ছিলাম না কোনোকালে।
চুলের গোছায় খুঁজিনি হলুদ ফিতে,
লুকিয়ে-চুরিয়ে দিইনি কাঁকই কিনে।
বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখিনি জরির কৌটো, প্রেমের ঘটনা আকছার ঘটত কত,
কখনো তো কোনো শঙ্খিনী খুঁজিনি এত।
আমি পাততাড়ি গুটালে কার কী এমন ক্ষতি?
আমার না থাকায়,
নদী ভাঙনের মতন কে এমন সর্বনাশা শূন্যের ঘূর্ণিজলে পড়বে বলো?

মানব কড়চা

জোড়া পাখির মতন মানুষ হয়নি আবার?
একসাথে খুদ-কুঁড়ো, জল খাবার খায় সারাক্ষণ;
এঁটো মুখে চুম্বনে ভরে দেয় ঠোঁট।
সারা দিন ছুটোছুটি, ওড়াউড়ি দিগ্বিদিক,
তবুও জলভরা চোখের মায়ায়, দীপের মতন উষ্ণ বুকের আবাহনে নিজ ডেরায় ফেরে তারা।
কলার ডোগার মতন মানুষ হয় বুঝি?
সবুজ পাতা ধরে রেখে,
আলো-ছায়ায় নিজের ভেতর জমিয়ে রাখে জল।
মাটির দিকে কেবল নতজানু হয়,
নিজের সবটুকু রস ফলকে দিয়ে ফলবান করে তোলে কাঁদি;
তারপর মাটির সাথে মিশে যায়,
রেখে যায় রসাল জীবনের গল্প।
পলিমাটি, বেলেমাটির মতনও মানুষ বিরল নয়।
উর্বর সতেজ—
ডাঙায়, জলে-কাদায় মাখামাখি হয় তাদের কেউ কেউ;
তবুও তীর, তট, তটভূমির সকাল-সাঁঝের,
আঁশটে জীবনে তারা মৎস্য ও ফসলের গল্প হয়।
এদের কেউ কেউ যারা বেলে মাটিজাত তারা শুকনো বালির মতো আলগা বাতাসে ঝরঝর করে ঝরে মেশে শূন্যে।
নদ, নদী, সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অববাহিকায় তারা লু হাওয়া।
কৈবর্ত, জোলা, কাহার, বেদে, বাগদির লোকজ জীবনে, অভুক্ত থাকার লড়াইয়ে জেতার মন্ত্র শেখায় না তারা।
পুরাণ কথায় লুপ্ত ঐতিহ্যকে ফেরায় যাঁরা,
যাঁদের কাছ থেকে ভাসমান, যাযাবর ও তাদের দূরবর্তী এবং অদূরবর্তী প্রজন্ম গাজী, কালু, শিব, কালী ও দশভুজার শক্তির পাঠ নেয়;
যাঁদের কথায়, ভাষায় মাতৃধারে বেড়ে ওঠা ভ্রূণ শক্ত, সোমত্ত হয়;
তারা দুগ্ধবতী নদী।
ইট, পাথরের মানুষ তো তাঁরা নয়,
মহীরুহকে জড়িয়ে লতিয়ে ওঠা পরজীবীও নয়;
তাঁরা এক একজন পিয়াইন, ঘুংঘুর, নালজুরি, ঝরকাটার মতন বহতা মানব নদী।

রংতুলির কাব্য

ছবি আঁকার মতো করে তোমাকে আঁকি,
সেখানেও তোমার কেমন পালায় পালায় ভাব।
ইজেল, রংতুলি, কার্টিজ পেপার সবই ঠিক থাকে;
তুমি কেবল শূন্যে হারাও।
যতবার তোমাকে ধরতে চেয়েছি রঙের রেখায়,
ততবারই তুমি রঙের চেয়ে রঙিন হয়ে উঠেছ।
সময়ের পলে পলে,
হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে;
আকাশের ভাঁজে ভাঁজে—
তুমি অনুভূতির ফুলকি হয়ে ফোটো।
পুরনো খাট, চৌকাঠ, দেরাজে ছড়াও সুগন্ধ।
কিন্তু পনেরো ফিট গুন পনেরো ফিট বর্গাকার হৃদয়ে তুমি সাদা-কালোই থেকে গেছ।
যতবার তোমাকে বাঁধতে চেয়েছি রংতুলির আঁচড়ে,
ততবার তুমি সরে সরে গেছ দূর থেকে দূরত্বে —
ছবির টলটলে নদী বাস্তবে কেমন করে হয়ে ওঠে বালুচর?
আড়াল করে করে;
ঘোমটা টেনে ঢেকে রাখো চাঁদপানা মুখ।
ইটভাটার গনগনে আগুন,
ঘড়ঘড় শব্দে বের হয় চিমনির ধুঁয়ো;
সকল শোষণ-তোষণকে উপেক্ষা করে,
নারী শ্রমিকের ঘর্মাক্ত শরীরে, চাপা কণ্ঠস্বরে তার পুরুষ সঙ্গীটির প্রতি যে ফিসফিস প্রণয় নিবেদন;
সেখানে তুমি কেমন করে হাজির হও খোঁপার কাঁটা হয়ে?
ছিমছাম জীবন,
বাধা বেতন;
পয়মন্ত স্ত্রীর বেশবাসে যে তোমাকে চেয়েছে, এঁকেছে,
তাকেই তুমি দিয়েছ ফাঁকি।
যে তোমাকে,
মস্ত নদী, হাজারটা চাঁদ আর উলুখাগরার বন দিতে চেয়েছে;
তার রংতুলিতে রেখা হয়ে ধরা দিয়েছ বারে বারে।

তোমার মন কথার নবপাঠ

সবাই বলেছিল ছলনা,
আমি বিশ্বাস করিনি।
যে আমার মৃত অনুভূতিকে জীবন বাজি রেখে পুনর্জীবিত করেছিল;
অবিচল আস্থায় তার নিঃশ্বাসকে দিতে চেয়েছিল আমার হাতের মুঠোয়,
বেলাভূমি হয়ে আগলে রেখেছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা;
সে এমনটা করতে পারে এ কথা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি।
অনেকে বলেছিল নকল জিনিস বেশি চকচকে হয়,
ওতে মন ভোলাবার মন্ত্র থাকে।
তবে কি তার লেখা এক হাজার দুইশ সাতচল্লিশটি চিঠির প্রতিশ্রুতিগুলো মিথ্যে?
উনিশ বছর সাত মাস পাঁচ দিনের এক একটি ধানি দুপুর, বেগুনি বিকেল কি মন্ত্রের
ভেলকি জালে আচ্ছন্ন ছিল?
অনেকে বলেছিল জল যা গড়ার গড়িয়েছে,
আর তা গড়াতে দিয়ো না।
ডুববে তুমি; কোনো তটরেখা খুঁজে পাবে না।
বেহুঁশ হওয়ার চেয়ে ভালো নয় কি কূলে ফেরা?
ওসব মায়া, কুহকিনী
তোমার চারপাশে রঙিন ধোঁয়ার বেড়;
ধোঁয়া সরে গেলে বুঝবে সব কেমন পোড়া পোড়া।
তবে কি কাঁঠালচাঁপা পুড়েছিল?
পুড়েছিল খড়ের ঘরে রাতভর কাঠচৌকিতে শুয়ে শুয়ে বোনা স্বপ্ন?
এমন তো নয় সে আমাকে ছুরি মেরে রাঙিয়েছিল তার হাত;
আমার ভালোবাসার আলনায় সাজিয়েছিল অন্য পুরুষের পিরান।
তবে তারে কেন লোকে মিথ্যে বলে?
প্রেমের পাঠ যে শেখে নাই,
যাদের কাছে ভালোবাসার মানে কলঙ্কের দাগ;
তারা তোমার মন না বুঝে,
আমার মনকেও করে তোলে নিমতিতা।

সাদামাটা বৃষ্টির দিন

কেউ কখনো আমায় বৃষ্টি দেখার আমন্ত্রণ জানায়নি,
একটা পুরো বৃষ্টি ভেজা দিন আমার জন্য কেউ কদম ফুলের মতন যত্ন করে তুলে রাখেনি।
মেঘ করে জল নামার আগে বারবারান্দায় দাঁড়িয়ে কতবার মেঘলা আকাশটার পানে চেয়েছি;
ভেবেছি বৃষ্টির বোল শুনলে তুমি খোঁপায় জারুল গুঁজে দাঁড়াবে কাঠজানালায়।
'দেখো আজ বৃষ্টি হবে, সারা ঢাকা শহরের অলি-গলি ভিজবে, তুমি দেখো তোমার উঠোনের খাঁচায় রাখা মুনিয়া পাখিটাও ভিজবে আজ।'
এমন আত্মবিশ্বাসে কেউ আমাকে বৃষ্টির আগমনের কথা কোনোকালে বলেনি।
বৃষ্টিঝরা বকুল কুড়ানোর দিন আসেনি কখনো;
পাতায় পাতায় বৃষ্টির গান,
চাদরে, বালিশের কভারে, ঝুমকোয়, বাজুবন্ধে বৃষ্টির ঘ্রাণ।
জলের পিঠে বৃষ্টির কোমল ছাপ,
কী আবছা আবেগে তর্জনীতে ধরো বৃষ্টির ফোঁটা,
ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে চেখে দেখো তার স্বাদ। তোমার গুনগুন স্বর তুমুল ঝড় তোলে বাতাসে।
তবুও আমাকে,
কেউ বলেনি আষাঢ়-শ্রাবণে কোনো কাজ রেখো না,
এমন করে খামে ভরে বৃষ্টির কথা কেউ লেখেনি;
কেউ বলেনি পোস্টবক্সে খোঁজ নিয়ো বৃষ্টি কাল আসবে কি না?
বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি যায়,
আমার জন্য ভালোবেসে কেউ হয়তো বৃষ্টি নামায়!
চিনি না তারে, জানি না তারে; গোপনে এসে, গোপনে হারায়।

পরাণকথা

পরাণের ভেতরে কথা হয়,
তার অলিন্দে দুঃখের হ্যাঙ্গারে আলাদা আলাদা করে ঝোলানো রুমালে, টি-শার্টে, মাফলারে এমনকি পা মোজায়;
বেদনাগুলো ভেজা কুয়াশার মতন শুয়ে থাকে।
বেহালার তারে চিত হওয়া সুর পাশ ফিরে জাগে না,
বোবা পরাণের ভাষা শালুকও আজকাল বোঝে না—
জীবনভর মুটে-মজুরের মতো করে যাকে, পাঁজরে পাঁজরে বয়ে বয়ে,ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাঁজর হয়েছে নীল;
সে নীলের ভাষা বোঝে না এখন,
এঁদো ডোবায়, কাদায়, শ্যাওলায় অনেক দিনের জমে থাকা প্রেম তরতরিয়ে উজানের জলে বয় না।
ভাটির চড়ায় আটকে পড়া নাওয়ের মতো সে কি অসহায়?
শালুক জানে প্রেমের বাদাম কে কবে তুলেছে আগে,
ঢেউয়ের আঘাতে কার ভেঙেছে পার?
ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় মোচড় লেগেছে কোথায়?
কেমন করে কালশিটে দাগ গোপনে দেগেছে বাণ।
অবোধ মাঝি বজরা ভিড়ায়, সাওয়ারি নামায়;
কূলে কূলে সে জনে জনে বলে শালুকগাঁথা।
হাঁসুলি পরা জেলে বধূ নয়নতারা, ছুতোর মিস্ত্রি গনু মোল্লার ঘোমটা টানা বউ পারুজান, লুলা কর্মকার কামাল শেখ, প্রতিমা কারিগর দয়ারাম কান ফেলে শোনে সে গাঁথা।
লোক প্রণয়ের এমন বয়ান, এত গাঢ়ভাবে এ তল্লাটে কে বলেছে?
ঘোলা জলে পরাণ বেঁধেছে অনেকে, শালুক বেঁধেছে কে কবে?

তুমি ও নয় হাজার পাঁচশ সাতান্ন শব্দ

আধো বোলে কেমন করে প্রকাশিত হও তুমি?
যে তোমাকে নয় হাজার পাঁচশ সাতান্ন শব্দের উপন্যাসে ধরা যায় না;
এক রিমে লেখা দীর্ঘ কবিতাতেও যে তুমি দুর্বোধ্য,
এক শ্রবণে কিংবা এক আষাঢ়ে কতটা বৃষ্টি হয় তা এখন পর্যন্ত কেউ মেপে দেখেনি;
সে বৃষ্টির সমপরিমাণ জলের চেয়েও তুমি অনেক অতল, অনেক গহিন।
তোমার মনে তাই তিস্তার মতো নাব্যতা সংকট নাই,
সারা দিন থইথই জলের তুফান।
তাই তোমার যৌবন ফিরে পেতে ভিনদেশের কাছে ধন্না ধরতে হয় না।
যে তুমি ঝিঙে ফুলের আলোয় ফোটো,
ঝড়ো বাতাসের মতো ছোটো দিগ্বিদিক—
তামাকের মতো কড়া রোদে তোলো হুলুস্থুল,
অমিত জীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে কে আঁকবে সে তোমার পটচিত্র?
অধরাকে ধরার সাহস যে সিংহের মতো বুকে পোষে সেও কি এমন পণ্ডশ্রম রাজি হবে?
ঘোড়ার খুরের মতো দশ-দিগন্তে তুমি তোলো ধূলিঝড়,
যে তুমি,
ছোড়া তিরের মতো এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলো বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল।
কার এমন সাধ্য—
সেই তোমাকে একটা অঙ্গুরীয়তে আটকে রাখবে?
কিংবা একটা বকুল পরা নাকফুলে করবে বশ?

কবিতা, তোমার জন্য

কবিতা, তোমার জন্য আমার এ মাঝিজীবন,
জীবনভর এ ঘাট হতে ও ঘাটে ঘুরেছি বানের জলের মতো;
শালুকের মতো কেবলই ভেসেছি ঘোলা জলে,
জলের সঙ্গে আজন্ম বাস, অথচ জলপরিরা আসেনি আমার ঘুমের ভেতর।
বরুণা আর নীরার মতো ওরা থেকেছে অধরা।
ওদের বুকের কাঁঠালি ঘ্রাণ পেয়েছে বর্গি, জলদস্যুরা।
আমি বিনম্র চিত্তে স্বীকার করে নিচ্ছি আমার এ দীনতা,
হাজারো প্রতিশ্রুতির বিনে সুতোয় শব্দের যে বিমূর্ত ঘর তৈরি করেছি কবিতার জন্য;
বারবারই তা ভেঙেছে স্বৈরশাসকের দল।
ইতিহাস আমার দিকে চেয়ে আছে সকরুণ দৃষ্টি মেলে,
কিন্তু কী করব আমি, আমি তো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এমন কেউ নই যে,
চৌদ্দতম সন্তান হয়েও ধরিত্রীর মুখ উজ্জ্বল করব।
নীললোহিতের জীবন আমার, তাই আজন্ম স্বপ্নকে তাড়িয়ে স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে
আজও পূরণ হলো না।
কথা ছিল স্বপ্নের ফুলদানিতে ফুল হয়ে ফোটার।
প্রতিশ্রুতি ছিল সত্য প্রকাশে অসংকোচ সাহস প্রদর্শনের।
কিন্তু তখন বুঝিনি হুমায়ুন আজাদেরা যুগে যুগে একবারই ভূমিষ্ঠ হয়।
এ কেমন অক্ষমতা আমার শেফালিকা বোসকে স্বপ্নে পেয়েও আমি জীবনানন্দ হতে পরিনি।
সুরজিৎ নন্দীর মতো কবিতার জন্য হৃদয়কে বারবার বেচেছি বিশ্বস্ত মানুষের কাছে।
যে কষ্ট নিয়ে হেলাল হাফিজ 'ফেরিওয়ালা' হয়েছিল,
ঠিক তেমনই কষ্ট নিয়ে আমাকে হতে হয়েছে কষ্টের গহিন গিরিখাদ।
এর চেয়ে উদ্ভিদের জীবন হয়তো ভালো ছিল,
এ আমার ক্ষমাহীন অপরাধ যে, আমি 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার কবির মতো জনপ্রিয় নই।
অনেকবার ভেবেছি নজরুল, হাফিজ, ইকবালের মতো লিখব কিছু কালোত্তীর্ণ কবিতা।
কিন্তু যতবারই আমি কবিতার দেশে গিয়েছি কবিতার খোঁজে, ততবারই আমাকে
ফিরতে হয়েছে মাইকেলের মতো নিদারুণ শূন্যতা নিয়ে।
এ আমার সীমাহীন অপারগতা যে, আমি বুদ্ধদেব, শঙ্খঘোষ কিংবা আল মাহমুদের
মতো করে লিখতে পারিনি মুঠি মুঠি সোনালি কবিতা।
এর চেয়ে ভালো ছিল রাজনীতি করা,
বাঙালির কাছে প্রতিশ্রুতি পূরণের থাকত না কোনো আত্মশ্লাঘা।
কবিতার জন্য আমি হয়েছি বিপন্ন মানুষ—
ঘর, সংসার, স্বজন, সুজন সব ছেড়ে কবিতার জন্য আমার এ নির্বাসন।
কবিতা, তোমার জন্যই রোদহীন ররফের উদ্যানে আমার এ নিঃসঙ্গ বসবাস।

সহজ বুনন

একটা শব্দই তো,
তাই উচ্চারণে এত দ্বিধা, এত জড়তা;
বুকের ভেতর দিন-রাত্রি এতটা ধুকপুকানি?
অথচ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ কেমন সহজে তা বলে;
তুমি তা বলতে গেলে কি বিষণ্ন ছায়া নামে তোমার চোখে।
অথচ তুমি কী অবলীলায় পড় দেবদাস,
পড় অন্যের পাঠানো নীল খামের চিঠি।
তখন তোমার কাঁপে না ঠোঁট,
নাকের ডগায় জমে না ঘাম।
ওই এক চিলতে আবেগই তো,
নদীর মতো তা তো আঁকাবাঁকা নয়;
তা দেখাতে গিয়ে এত আড়ষ্টতা,
এত গোপন ব্যথায় তোমার বুক ভারী হয়ে ওঠে।
নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে,
পোড়ানো আমের মতো সিদ্ধ হয় কি শরীর?
ওই এক রত্তি আশকারাই তো,
একটু-আধটু আবদারই তো বলো;
ভুবনডাঙার মাঠ তো কেউ তোমার কাছে চেয়ে বসেনি।
এর চেয়েও ঢের বেশি দামি জিনিস তোমার হাত গলিয়ে পড়ে যায়।
অবলীলায় অনাহুতকে তুমি দান করো,
যা অন্যকে দিলে অযাচিতভাবে;
তার সিকিটুকুও কখনো কখনো তোমার কাছে কেউ চেয়ে পায় না।
ওই এক পল অনুভূতিই তো,
তাতেই তোমার এত কৃপণতা—
তাই হাঁড়িতে চাল মাপার মতো করে কেমন মেপে মেপে দাও।
অমিত যেমন করে চেয়েছিল লাবণ্যের কাছে,
তেমন করে তো কেউ তা তোমার কাছে চায়নি বলো।
পাথরে ফুল ফোটে শুনি—
অথচ ফোটা ফুলকে তুমি কেমন করে পাথর করে দাও।
'ভালোবাসি' এ শব্দ উচ্চারণে এত অস্বস্তি তোমার!
এর আবেগে ভাসতে এত শঙ্কা?
এর আশকারায় এত ভয়?

এর অনুভূতিতে এত অসাড় তুমি?
অথচ তুমি জানো না,
কারও কারও কাছে 'ভালোবাসি' শব্দটা উচ্চারণে;
বুকের ভেতর রক্তের সঞ্চালন কেমন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।
কেমন আশকারায়, কেমন আবেগে কেউ কেউ এ সহজ কথাটা বলার অপেক্ষায় থাকে জনমভর।

মধুরিমা ও একটি জীবনের গল্প

মধুরিমা, মধুমতি নদী নয়;
তবুও তাঁকে নদী বলে জানতাম।
ঘুমের ভেতরে সে জলের শব্দ হতো,
লালপেড়ে হলুদ শাড়িতে স্তনাভারে নুইয়ে পড়ত তার বেতলতা শরীর।
শরৎ মেঘের মতন লাজুক তার মুখে জলের ভাষা; পড়ার আগেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা হারিয়ে যেত।
এক একটা সূর্যাস্ত ছিল তার টিপের মতো,
খসে পড়ার আগে অন্ধকারে ছেয়ে যেত মন।
মধুরিমা মন্ত্র পড়া জীবন সহচরী ছিল না কখনো;
তবুও তাকে আশ্রয় বলে জানতাম।
ভাদ্রের দুপুরে একলা জীবনে তাকে মেঘ বলে মানতাম।
প্রেমিকার চেয়েও অধিক গাঢ় ছিল তার চোখের ছায়া;
মধুরিমা, স্মৃতির সিন্দুক ছিল না;
ছিল না কুয়াশার দিন।
তবুও তাঁকে আহ্লাদ বলে জানতাম,
কোনো কোনো হাটবারে দেখেছি তাঁকে কাঁকই হাতে চুড়িওয়ালার সাথে দরদাম করতে।
কখনো সুগন্ধি সাবান শুঁকে দেখতে,
সে ছিল না স্মৃতির রুমাল, বিস্মৃত মুখ;
সে ছিল জীবনমুখর, পরাণে পুষে রাখা সুখের অসুখ।

মধুরিমা ও হেমন্তের পঙ্‌ক্তিমালা

হেমন্ত রাত দরজায় আসে আজকাল বোঁটাখসা শিউলির গন্ধ নিয়ে।
চাঁদের আলোয় গোসল সেরে নেয় রাত,
নদী জেগে থাকে;
ঝিনুকের বুকের ঘুম চুষে নেয় মুক্তো।
নাকফুলের মতো কিছু তারা মধুরিমার দেহে ঢুকে পড়ে।
হেমন্ত আসে মাঝরাতে ছাতিম ফুলের মাদকতা নিয়ে।
রাত জানালায় তখন,
জাদুকাটা নদীর ঢেউয়ের শব্দ শুনি।
বাড়ন্ত ডুমুরের বুক থেকে তখন যৌবন চুষে নেয় তৃষ্ণার্ত বাদুড়।
জলে ভাসে জলপরির গতর,
ভাটির দেশ থেকে আসে বেদের দল;
জলে বাঁধে ঘর।
হেমন্তের কুয়াশায় ভেজা শেষ রাতে,
মধুরিমা এসেছিল কি জলঘরে?
বোঁটাখসা শিউলি জানে না, জাদুকাটা নদী রাখেনি সে খোঁজ।

মধুরিমা ও একটি অপূর্ণ প্রেম

মধুরিমা,
একবার আমার দিকে চেয়ে দেখো;
প্রেমপত্রের প্রেম খারিজ করে দিলেই তা মন থেকে কালির মতন মুছে যায় না।
বহুদিন ধরে রোদে পুড়েছে যে কার্পাসের ফল,
তার থেকেও বেশি তৃষ্ণা ছিল আমার গলায়।
তুমি কেবল পালের মতন উড়িয়েছ তোমার চুল।
হালকা রোদে আজকাল তোমার শরীর চিতল মাছের মতো তড়পায়;
অথচ আমি কতটা রোদ সহিষ্ণু ঘাস হয়েছি তা একবার ফিরেও দেখোনি তুমি।
ডাঙার জীবনের খাট-পালঙ্কে তুমি খুঁজেছ যে সুখ,
সে সুখের ছিটেফোঁটাও কি দেখোনি আমার জলজ চোখে?

মধুরিমা, বহতা সময়ের স্বর

মধুরিমা এক একটা দিন কী যে পূজনীয় হয়ে ওঠে তোমার নকশাকাটা শাড়ির উপস্থিতিতে;
এই বুনো ঝোপঝাড়, কাদাময় জলাজঙ্গল, আর অযত্নে ফোটা হেলেঞ্চার ফুলও সেদিন আরাধ্য হয়ে যায়।
তোমার হরিতাভ দেহে যেদিন কেয়া পাতা ছড়িয়ে দেয় মিহি চাঁদের আলো,
একাদশীর উপোস পালন করেও তুমি সেদিন ষোলোকলায় পূর্ণ নারী হয়ে ওঠো।
ডুমুরের থোকার মতন যে যৌবন তুমি পেয়েছ তা কেবল হরিণীর প্রেমজ জনমের সাথে তুল্য।
এক একটা রুগ্‌ণ দুপুর তোমার উপস্থিতিতে হয়ে ওঠে জোয়ান মরদ;
তোমার বেণীজুড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় যে বর্ষা বিকেল,
সে বিকেলও দুরুদুরু বুকে তোমার মনপুকুরপাড়ে আরতির থালা হাতে দাঁড়ায়।
মধুরিমা, এই শান বাঁধানো ঘাট, মুকুলন্তনাভারেনত আমের ডাল, চোরকাঁটা তোমার অপেক্ষায় থাকে।
এই ঠ্যালাগাড়ি, টমটম, পানসি, ট্রামপথ, রেলগাড়ি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলকে পেছনে ফেলে মধুরিমা তুমি হয়ে ওঠো শঙ্খধ্বনি, আলো বিচ্ছুরিত আলোর মিনার।

মধুরিমা ও একটি অপ্রকাশিত ছেলেবেলা

সেই ছোটোবেলা থেকে ধ্যান বলতে তোকেই বুঝেছি,
চোখ বন্ধ করলেই চিতলখালি নদীর কলকল জলের শব্দে;
আর তিনকড়ি বিলের মাঝে দেখেছি তোর অফোটা পদ্মপাতা মুখ।
চুড়িওয়ালা যখন বলত, 'চাই রেশমি চুড়ি।'
তখন দেখেছি সেই ডাকে তোর চকিত চোখে গোলাপি চুড়ির ছবি।
তারপর থেকে আমি চুড়িওয়ালাই হতে চেয়েছি।
ঝিনুকের কানপাশা যেদিন পরতি মনে হতো তোর কানে অথই জল নিয়ে নীল সমুদ্রটায় ঝুলে আছে।
তোর টিপের রং গুনে গুনে অঙ্ক কষতে শেখা,
ছড়ানো-ছিটানো তিলগুলো জুড়ে কৌতূহলের চোরা আনাগোনা।
ছেলেবেলার জ্ঞানে ও ভাবে মৌচাকের মতন তোরই মন একটু একটু করে করেছি সঞ্চয়।
ডুবিডুবি সূর্যের যে আভাটা তোর সিঁথিতে এসে পড়ত মধুরিমা,
আমি সে সিঁথিজুড়ে রচেছি আমার স্বপ্ন;
বিনুনির মতো বেঁধেছি আমার ঘর।
শাসনে, আদরে, আবদারে, অনাদরে নামতার মতো জপেছি তোর নাম।
কাগজে লিখেছি মধুরিমা, তাবিজে ভরেছি তা যত্নে; অতঃপর কালো সুতোয় বটের ঝুরিতে ঝুলিয়ে দিয়েছি সে নাম।

আমি যে মধুরিমাকে চিনি

আমি যে মধুরিমাকে জানি, উজানের জলের তোড়ে ভেসা আসা সে এক বল্লাহীন
ধলেশ্বরী ছিল তখন।
নগরীর লুপ্ত ইতিহাসের খড়িতে যার যৌবন;
ভূ-কম্পন তুলে ওলট-পালট করেছিল লাখো পুরুষের হৃদয়।
এ নগর তখন তিলোত্তমা ছিল না,
হাম্মামের গরম জলে যে সব রাজকুমারী স্নানের জন্য
ব্যবহার করত বাগদাদী আতর;
তারাও মধুরিমাকে হিংসে করত।
তার হরিতাভ চোখে শীত বিকেলের ভাপা পিঠের আর্দ্রতা;
তার শিককাবাবের মতন উষ্ণ ঠোঁটের কথা, নগরের পানশালায় তরুণী সাকি
সকলের কাছে বলে বেড়াত।
মধুরিমা নিস্তব্ধ এ শহরে তার দিঘল চুলে এনেছিল বকুলভেজা রাত।
মুঠোয় সফেদ সকাল,
আমি যে মধুরিমাকে চিনি সে কোড়া পাখির ডাক শুনে কাস্তের মতন চাঁদের সামনে
দাঁড়িয়েছিল;
একটা ছাইবর্ণের আকাশ আর ঢোলকলমির জীবন চেয়েছিল সে।

চেনা-অচেনার মুখোচ্ছবি

কোন মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি তোর মন?
সারা দিন কেমন ভেজা পলির ঘ্রাণ লেগে থাকে,
শঙ্খী নদীর মতো তরতরিয়ে বয়ে যাস।
অথচ আমি ছুঁলেই হোস ঘোলা জল;
ঘরজুড়ে এত আলো-বাতাস,
জানালায় মেঘের পর্দা কেমন শাড়ির কুচির মতো গায়ে গায়ে লেগে থাকে;
পলাশ গাছের গুঁড়িটায় সন্ধের সূর্যটা নেমে আসে,
রাতে লাল টকটকে ফুলগুলো কেমন আতশবাজির মতো দেখায়—
তোর খোঁপাজুড়ে হাজারো পলাশ ফোটে দিনে-রাতে।
সাঁওতালি নারী নোস জেনেও,
আমি মাদল বাজিয়ে পাহাড়কে জানাই তোর আসবার খবর।
তাবৎ দুনিয়াজুড়ে যখন নামে নিশীথিনীর গাঢ় আঁধার,
চাঁদের শেষ দিপালিটুকু জ্বলে জ্বলে;
যখন তোর শিথানে এসে লণ্ঠনের আলো নিভিয়ে ভোরের গান শোনায়—
তখন তোর চোখে নামে বেহুলার ঘুম।
কত গারো, মগ, মুরং, হাজং যুবারা আমার কাছে শুধায় তোর কথা,
পাহাড়ি ছড়ায়, টলটলে নদীর জলে, গিরির সর্বোচ্চ চূড়ায় ফুটে থাকা ভাঁট ফুলকে
জানিয়ে দিই তুই আসবি।
তুই,
কুয়াশার রেখা মুছে,
লাল সুরকির পথ মাড়িয়ে—
আমার লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ বদলে দিয়ে,
সারা গায়ে পুরাণ-রূপকথার অনুভূতি মেখে—
দিব্যি দাঁড়াবি চেনা-অচেনার মাঝখানে এসে।

এ শহর একদিন

এ শহরের নাভিতে একদা চালতাগোলাপের ঘ্রাণ ছিল,
তরমুজের মতন লাল টকটকে ছিল তার যৌবন।
হাতুড়ে-কাস্তের চিহ্নাঙ্কিত পতাকা পতপত করে উড়ত নীলাভ আকাশে;
নারীর ক্ষীণ কটির মতন একটা সরু নদী ছিল এখানে,
ছোট্ট নদী, কিন্তু কাচের গুঁড়োর মতন চকচকে জল ছিল।
ডিঙি নৌকো ভরতি ম্যাগনোলিয়া ফুল;
জলের ওপর শাদা মেঘকে নামিয়ে আনত।
তখনও চিমনির ধোঁয়ায়,
এক্সে প্লেটের মতন কালশিটে দাগ পড়েনি কিংশুক ফুলের গায়।
প্রণয়ে, পরিণয়ে অলিতে-গলিতে হল্লা হতো,
ব্যান্ড বাজিয়ে প্রিয়তমার কপালে চম্বুনের রেখা এঁকে
দিয়ে সাহসী পুরুষ তার অনামিকায় পরাত ভালোবাসার রিং।
এ নগরের মানুষের কাছে তখন
আঁধার মানে,
গাঢ়ো বিষণ্নতায় ডুব দেওয়া নয়—
তা ছিল চাঁদ ওঠার ইশারা,
ফুল ফোটার গল্প, চেনা সকালের জন্য অপেক্ষা;
সূর্যস্নানের জন্য তৈরি হওয়া।
এ শহর সীমান্তের সেনানীর মতন জেগে থাকে,
শ্রমিকের পায়ের স্পর্শে জেগে ওঠে মৃত রাজপথ।
সাইরেন বাজিয়ে নোনাজলে ভাসে জাহাজ,
পানশালায় রাতের শেষ তারাটি নেভার পূর্ব পর্যন্ত চলে ফিসফাস আলাপন।
এ শহরের বুকে রডোডেনড্রনগুচ্ছ গোধূলির রঙে কী ভীষণ রঙিন,
টিউলিপের বাহারি রঙে মোড়ানো এ নগরীর প্রাচীন শরীর।
হঠাৎই শহরের রাজপথে গলগলিয়ে রক্তের স্রোত,
শপশপ বুটের আওয়াজ
শ্রমিকের রক্তে ভেজা শার্ট, ছেঁড়া চটি, দলানো-মুচড়ানো সাইকেল;
ছিটকে পড়া টিফিন ক্যারিয়ারের খাবারে কুকুরের লোলুপ জিহ্বার স্পর্শ।
রুগ্‌ণ রাজপথে লাল পতাকায় ঢাকা সারি সারি কফিনের মিছিল।
জলে ভাসা মেঘের মতন নিরাপদ ছিল যে কুমারীর বুক,
সেখানেও শকুনের বীভৎস ওড়াউড়ি।
ষাঁড়ের মতন বর্বর রমণ ক্রিয়ায়,

গর্ভবতী নারীর মতন স্ফীত হয়েছে এ শহরের কোমল শরীর।
কুমিরের মতন হাঁ করে থাকা সাম্রাজ্যবাদ,
এ শহরকে ঠেলে দেয় তার ক্ষুধার্ত জঠরে।
চালতাগোলাপের গালে বিষাক্ত দাঁতের ছাপ,
সরু নদীর জল ওয়াইনের মতন তামাটে।
তবুও এ শহর দেশলাইয়ের মতন তার স্বপ্নের কাঠিটি
জ্বালিয়ে রাখে,
নগরের প্রতিটি মানুষের চোখে আশা জাগে,
কোনো একদিন এ শহরের প্রতিটি বাড়ির কার্নিশে,
প্লামেরিয়া ফুলের মতন লাল পতাকা উড়বে আবার।

কবিতা বিরহের অন্য নাম

নিঃশ্বাসের ভেতর কবিতার শব্দরা আজকাল নীল ভ্রমরের মতন গুনগুন করে না।
তোমার নীল নাকফুলে ওরা কবে বন্দি হলো তাও বলে গেল না।
পা টিপে টিপে হাওয়ারা আসে,
চুম্বনে ভাঙে সন্ধ্যামালতীর ঘুম;
মাছরাঙার মতন নিঃসঙ্গ দুপুরে কবিতার দোরে সে হাওয়া কড়া নেড়ে নেড়ে
নিঃশব্দে চলে যায়।
ভাবি শব্দেরা এলো বুঝি,
কিন্তু তারা আর আসে না।
তোমার মতো তারাও অন্য কোথাও, অন্য কারও ঘর-গেরস্থলি করতে ব্যস্ত;
শূন্য কলমটা শাদা শাড়ি পরা বিধবার মতন নিষ্প্রাণ।
ভাষা বলে গেল হাওর-বাওরের জেলেদের কাছে ঘুরে আসবে কদিন,
বললাম তাকে—'ফিরবে তো আবার?'
শব্দের মতো করবে না ঘর অন্য কারও?
সে বলল, না, যদি যায় তবে দেশমাতৃকার মিছিলে, স্লোগানে ঝড় তুলব একদিন।
আমি বললাম—'মাথার দিব্যি রইল,
আমার কবি হওয়ার আহ্লাদটুকু আসকারা পেতে দিয়ো,
ডান হাতের বৃদ্ধা, তর্জনী আর মধ্যমার ভেতরে তাকে বাঁচতে দিয়ো।'
উপমারা বলল, ভোরের সাথে গ্রামে-গঞ্জে থাকবে কিছু দিন,
তাঁতি, ময়রার ঘরে করবে বাস।
হারিকেনের ঘোলা আলোয় মাকুর ঘটঘট আওয়াজ শুনবে তারা;
বললাম যাও, আবার আসবে তো?
রহস্যমাখা হাসি হেসে বলল, আসব বই কি;
অনেক দিন হলো গাঁয়ের জ্যোৎস্নার সাথে তারা ঘর করছে।
এক জীবনে কবি হওয়ার আহ্লাদটুকু পূরণ হলো না আর,
আসকারা পাওয়া অনুভূতিরা বরফ জলে গেল মিশে;
তোমার চোখের অপাঠ্য বিষণ্ন বিকেলের গল্পের মতন তা রয়ে গেল অধরা।

বীজমন্ত্র

১

কতজন কত কিছু নিয়ে বাঁচে,
ট্রেন মিস করা পঙ্গু যাত্রীটি ভাবে,
পরের ট্রেনে সে ঠিকই উঠবে, ফেরি করে বেচবে গজা, মটকা, কটকটি।
নষ্ট ডিমের মতন ঘোলা অন্ধকারে,
পদ্মকলির মতন দুটি চোখ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে।
হতাশার ঘরে সে চোখ দুটিতে প্রখর উত্তাপ,
কংকালের মতন কটা হাড় নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানুষকে সে শেখায় বেঁচে থাকার মন্ত্র।

২

শীত পড়তে না পড়তেই যে নারীটি পাড়ার মোড়ে
চিতই পিঠা বানিয়ে বিক্রি করে,
যাকে পাড়ার ছেলেরা চিতই মাসি বলে ডাকে;
সেও বেঁচে থাকে ঘরে তার বোবা ছেলেটির হাসি দেখবার জন্য।
স্নান করিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে ভাত মেখে খাইয়ে দিতে দিতে সেও ভাবে—
'হোক না বোবা তবুও বেঁচে থাক আমার নাড়ি ছেঁড়া ধন।
মা বলে না ডাকুক, ফটিক জল পাখির মতন মায়াভরা চোখে তাকিয়ে থাকুক না।'
কুশিডাঙা হাটে যে ছেলেটি সাইকেলের পার্টস মেরামতের কাজ করে,
টায়ারের মতন গোলাকার জীবনের বৃত্তে যে বন্দি;
উত্তরাধুনিকতার পাঠ যার অজানা,
ভোট হলে ঘরে ঘরে লাল, নীল না শাদা পতাকা উড়বে সে জানে না।
স্পোকের জট খুলতে জানে সে,
কিন্তু রাজনীতি সে বোঝে না।
বিয়ারিংয়ের মতন তার চিন্তাগুলো কেবলই ঘোরে;
সে ভাবে তার মেটে বাড়িতে কবে আসবে বিদ্যুৎ, ব্যবস্থা হবে সুপেয় জলের।
জোছনার আলো আর কেরোসিন কুপি জ্বালিয়ে অন্ধকারকে সে আর কতদিন দূরে দূরে রাখবে?
অমাবস্যার রাতগুলো ছায়াপথের মতন দীর্ঘ হয়।
তবুও সে বাঁচে এই ভেবে, আসছে পুজোয় টাকা জমিয়ে মায়ের জন্য কিনবে একটা খোলপাড় তাঁতের শাড়ি।

৩

ধর্মতলা স্টিট্রের মোড়ে ট্রাফিক সিগনালের লালবাতি জ্বললে যে মেয়েটি বকুল,
বেলির মালা হাতে পলিশ করা গাড়ির জানালার কাচে টোকা দিয়ে বলে,
'বড় সুগন্ধি বকুল আর টাটকা বেলকুঁড়ির মালা আছে বাবু, নিবেন?
দিদিমণির খোঁপায় বেশ মানাবে।'
চকচকে, ঝকঝকে চুন করা চেহারার গাড়ির মালিক স্বয়ংক্রিয় বাটন চেপে গাড়ির গ্লাস তুলে দেয়।
শতাব্দী পুরনো কলকাতার ধুলো সে গাড়িতে ঢুকতে পারে না,
আলো ঝলমল কলকাতায় এরা বড্ড উটকো ঝামেলা।
গাড়ির কালো গ্লাসের আড়ালে আর তাকে দেখতে হয় না মেয়েটির ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন পোশাক।
আগুনের মতন ঝাঁ রোদ্দুরে,
মেয়েটির মুখের নোনতা ঘামের গন্ধ তাকে সহ্য করতে হয় না।
সারা দিন এক কোষ সাপ্লাই জল ছাড়া আর যে কিছুই খায়নি,
রাস্তার বিজলি বাতিগুলো নিভে গেলে;
গঙ্গার বুকে বাতাসের সঙ্গে জোলো অন্ধকার যখন হামাগুড়ি দিয়ে নামতে থাকে,
তখন মেয়েটি তার বারো বছরের অন্ধ ভাইটিকে নিয়ে কালীঘাটে আসে।
সারা দিনের গনগনে রোদ শেষে,
কালো মেঘ করে বৃষ্টি নামে ।
আজ একটাও ফুলের মালা কেনেনি কেউ,
মেয়েটি মা কালীর চরণে ফুলের মালাগুলো রেখে,
পূজারী, ভক্তদের রেখে যাওয়া উচ্ছিষ্ট খাবারের ঠোঙা কুড়িয়ে নেয়।
গঙ্গার পারে ঝুম বৃষ্টিতে বসে অভুক্ত দুটি ভাই-বোন,
গোগ্রাসে গিলে এঁটো খাবার।
গঙ্গার জলের মতন মেয়েটির চোখেও বন্যা নামে,
অন্ধ ভাইটি বোনের মুখ হাতড়ে চোখের নোনতা জলের স্পর্শ অনুভব করে বলে—
'দেখিস দিদি আগামীকাল তোর সবগুলো মালা বিক্রি হবে।'
মেয়েটি ভাবে,
ঈশ্বর তাকে আর কিছু না দিক চোখের জন্য গঙ্গা নদীটিকে স্থির করে দিয়েছেন।
কতজন কত কিছু নিয়ে বাঁচে,
গঙ্গা, মেয়েটির জমজ সহদোরা;
মেয়েটি গঙ্গাকে নিয়ে বাঁচবে।

৪

মানুষ হারে না,
একিলিসের মতন নিয়তির হাতে সে বন্দি।
সুখী মানুষেরও থাকে সুখের অসুখ,
দুঃখী মানুষ বাঁচে আকাশ নিয়ে,
সুখী মানুষ বাঁচে বনসাই হয়ে।
ঊর্ধ্বমুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দা তাঁরা, তবুও তাঁদের হতে আকাশ কত দূরে।
দুঃখী মানুষ হাত বাড়ালেই আকাশ পায়,
সুখী মানুষেরা পায় দেয়ালের পর দেয়াল।

মেঘ ও বৃষ্টির আলাপন

কেউ আমাকে অনেক দিন বৃষ্টি দেখতে বলে না।
অন্তত একজন আমাকে নিয়মিত বলত বৃষ্টির কথা,
ঘড়ি দেখার মতো সে বারবার মেঘ দেখত।
তার সাথে সিনেমায় গেলে,
রিকশার হুড তুলে চললে;
কফিশপে কফি খেতে দাঁড়ালে,
বৃষ্টি নামত।
মঞ্চনাটক দেখে বের হলে,
বিশেষ কোনো দিনে, বিশেষ কোনো সাজ-পোশাকে;
নদীর পার ধরে হাঁটলে,
সন্ধ্যা গোধূলিতে সূর্য ডোবা দেখলে
বৃষ্টি নামত।
জয়নুল গ্যালারিতে ছবির প্রদর্শনী দেখে ফিরতে,
বইমেলায় পছন্দের বই কিনে বেরোলে,
চানখারপুলে হোটেল 'নীরব'-এ দুপুরে বিশ পদের ভর্তা ভাত খাবারের পরে;
বৈশাখী মেলায় নাগরদোলায় চড়লে,
বৃষ্টি নামত।
খেজুরমাথির মতন কোমল চোখ তার,
সে চোখের ভেতরে গম্বুজের মতন মেঘের দল;
পাহাড় হতে থরে থরে নেমে আসে সমতলে।
সিন্দুকের ভেতর আটকে থাকা সুখ,
রূপোর কৌটোয় জমানো সব শখ-আহ্লাদ আমাকে দিয়ে;
সে বৃষ্টিটাকে চিরস্থায়ীভাবে পেতে চেয়েছিল।
পান্তা ভাতের মতন জলপোরা জীবন আমার।
বৃষ্টির সঙ্গে চোখের জল বদল করে দুঃখ কমাতে চেয়েছি কতবার;
সুখ আর আহ্লাদ সে তো ডুমুর ফুল,
তাই সহজেই রাজি হয়ে যায়।
জল-কাদায় বর্ধিষ্ণু হৃদয় ভাবে,
টাটকা রোদে এবার শুকোবে তার পালক।
কটা দিন ভালোয় কাটে,
রসে ভরা জিলাপির মতন কেমন একটা সুখ সুখ ভাব।
জীবনের বিবর্ণ ঘাসে লাগে চকমকে রোদ্দুর।

এরপর যত দিন গড়ায় ঘুমের ভেতর গলা শুকিয়ে কাঠ হতে থাকে,
জলের গ্লাসে জল খুঁজে পায় না।
তেতেপুড়ে আসি যখন,
মেঘের দিকে তাকালে অষ্টপ্রহর শুনি তার কান্না;
কত তুচ্ছ বিনিময়ে আমি তাকে বিক্রি করেছি।
প্রিয় নদীটি এখন জলশূন্য,
মাথার চুল এখন খরখরে,
সে চুলে বৃষ্টির জল বিলি কাটে না;
জলশূন্য কুয়োর মতন আমার জলশূন্য চোখ।
এখন ভাবি বৃষ্টির ফোঁটাগুলো শাদা শিউলি করে কেন সে খোঁপায় পরতে চেয়েছিল?
হাঁটুজল পেরিয়ে কেন সে মেঘের আঙিনায় হাঁটতে চেয়েছিল?
তৃষ্ণালু মন আকাশের সীমায় অকারণে বাজপাখির মতন চক্কর খায়।
অনেক দিন আমাকে কেউ বৃষ্টির কথা বলে না।
ঝড়ো বাতাসে হাত ধরে কেউ টানে না,
ভরা নদীর গল্প শোনায় না;
মুঠো করে জল ভরে চোখ ভেজায় না।
অনেক দিন ঘড়ি দেখার মতন মেঘ দেখি না।
হাতঘড়িটা পরে নিতে কেউ বলে না,
বৃষ্টিতে ভিজবে বলে শাহবাগের মোড়টাতে কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকে না।
মেঘ কালো হয়,
বারান্দায় দাঁড়ায়,
বৃষ্টি নামে না।
চারদিকে জল, আমি পড়ে থাকি খরখরে ডাঙায়।
বৃষ্টি বেচলে বৃষ্টি আসে না,
আকাশ কিনলে যেমন কেউ জমিনে ফেরে না।

শব্দচিত্র : ০১

মৃত্তিকা দিয়ে কত কী গড়া হয়,
মটকি, ডাবর, ভাক্কুন, কোলকি, ঝাঁজর, দোনা;
তোমার মতন মুখ আর কেউ গড়ে না।
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা এমনকি কালীকেও;
কী নিপুণভাবে গড়ে তোলে মৃৎ কারিগর।
কেবল তোমাকে গড়তে ওদের হাত কম্পমান, মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত, চিত্তে বৈকল্য।

শব্দচিত্র : ০২

তোমার মদিরাক্ষী চোখ গড়তে গিয়ে ওরা কী ভীষণ নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।
বিশ্বাস করো ভদকা, হুইস্কি, শ্যাম্পেন খেলেও অত নেশা হয় না।
তোমার বুকের গড়নে সবচেয়ে বেশি অপ্রণয়ী হয়ে ওঠে ওরা,
খাঁড়া পর্বতের ঢাল হঠাৎই কী করে জলাভূমি হয়ে ওঠে!
ঊর্ধ্বমুখী তির কি কখনো আনত সূর্যমুখী হয়?

কষ্ট করে মনে রেখো না

কষ্ট করে মনে রেখো না,
উইয়ে খাওয়া ভালোবাসার কথা।
রেললাইনের মতন দীর্ঘ কষ্ট আমার ছাড়া আর কার আছে?
কুন্দ ফুলের একটা মালা আমার মতো আর কে গাঁথে?
সব মানুষের আকাশ থাকে,
রোদ, ছায়ার গল্প থাকে;
বনমল্লিকার বাগানজুড়ে কেয়ারি করা ফুল থাকে।
সুখ-দুঃখে গল্প করার একটা বাধা নারী থাকে,
আমার মতো একটা নূপুর কে কবে কিনেছে বলো!
আমার মতো খরা নদী আর দশটা আছে কি বলো?
আমার মতো হ্যাংলা মাছি কতটা তুমি দেখেছ বলো,
আমার মতো জীবন বেঁচে বোহেমিয়ান কে হয়েছে?
কষ্ট করে মনে রেখো না,
কাঠগোলাপের দিনগুলো;
চিনে বাদামের খোসায় খোসায়,
ঝাল চানাচুরের ক্ষণগুলো।
কাঠ জানালায় উঁকি দেওয়া নাগকেশরের মেঘগুলো;
কার এমন দুঃখ আছে আষাঢ়ের মতন স্যাঁতসেঁতে!
কার এমন কান্না আছে গোমতির জলে যায় ভেসে?
কার এমন ব্যথা আছে রক্তের মতন লাল হয়ে!
কষ্ট করে মনে রেখো না,
ভরা ভাদ্রের কোনো দুপুরবেলা;
শেয়ালকাঁটা ফুল দিয়ে বেণী তুমি আর বেঁধো না।
জমি, জমা, তালুক গেলে;
মামলা মোকর্দমায় আবার ফেরে।
ভালোবাসা ফেরে কী বলো কোর্ট কাচারির বিচার শেষে?
আমার মতো এক তরফা এমন ভালোবাসে কজন?
আমার মতো একটা বাঁশি আর কজন বাজায় বলো?
আমার মতো একটা সুরের দুঃখ আর কজন রোচে?
কষ্ট করে মনে রেখো না,
দুঃখ করে ভুলেই যেয়ো, ভুল ভাঙানোর গানগুলো;
মন থেকে না হয় মুছেই ফেলো বৃষ্টি ভেজা রাতগুলো।

শুকিয়ে গিয়ে ঝরেই পড়ুক আকন্দের ফুলগুলো,
আমার মতো রাত জেগে দুঃখের জোছনা কে মেখেছে?
আমার মতো দশ হাজার মাইল একলা একলা কে হেঁটেছে?
আমার মতো শূন্য হয়ে, কাঙাল হয়ে দ্বারে দ্বারে কে ঘুরেছে?
ভালো তুমি বাসবে না জেনেও কজন এমন ভালোবেসেছে?
হাড় কাঁপানো শীতে তোমার চাদর হয়ে কে এসেছে?
ঠাণ্ডা কপাল ছুঁয়ে তোমার কে বলেছে কফি খাবে?
আমারই তো দোষ বলো,
এক বালিশে রাত কাটায়;
অনেক দিন হলো রেলে আমি একটা সিটই রিজার্ভেশন চাই।
এক থালা ঠাণ্ডা ভাত একাই গিলি গোগ্রাসে
একটা দুঃখের নদী আমি একলা একলা পুষে বেড়ায়।
একটা পাহাড় প্রতিদিনই একা একা পেরুতে হয়।
কষ্ট করে মনে রেখো না,
স্বর্ণচাঁপার বিকেলগুলো;
টিপটিপ বৃষ্টিগুলো চুলে আর নাই বা মেখো,
সুখের ঢেকুর তুলে না হয় সুখে থাকার ভান কোরো;
নাটাইয়ে জড়ানো কষ্টের ভাগ কে আর বলো নেবার আছে?
আমি না হয় সিঁদুরে সাহেলি একলা কোনো পাখি হব,
যার যাবার তারই যায়—
একলা শ্রাবণ বান ভাসায়।
কষ্ট করে মনে রেখো না,
ভালোবাসা যার হারায় তার কাছে আর কী খোঁজো?
নষ্ট না হয় আমিই হয়েছি নষ্ট ফল গন্ধম খেয়ে,
কষ্ট যা পাবার আমিই পেয়েছি নির্বাসনে একলা গিয়ে।

বেনেবউ

কোনো কোনো দিন বেনেবউ পাখিটা,
শাল কাঠের জানালায় এসে বসে।
তামাকের মতন কড়া দুপুরের রোদ ওর গায়ে পড়ে;
তবুও পাখিটা নড়ে না।
ঘরের আনাচে-কানাচে খোঁজে যেন কাকে,
তুমি নাইওর গেছ ও সেটা জানে না।
আর কখনো ফিরবে না এ কথা বুঝতে পেরে;
তাল শাঁসের মতন ওর নরম চোখ জলে ভরে ওঠে।
বাঁশের আড়ে মেলে দেওয়া দুপুর রঙের শাড়িটার দিকে,
তাকায় বারে বারে।
জোড়া বালিশের একটার অনুপস্থিতি সে বুঝে ফেলে।
শূন্য বিছানার ওপর আলতার শিশি, কাঠের কাঁকই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রং-
বেরঙের চুল বাঁধা ফিতে, কাচের চুড়িগুলো পর্যন্ত ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।
রসুইঘর সুনসান, কোনো হাঁড়িকুড়ির ঠোকাঠুকির শব্দ সে শোনে না।
গৃহকর্তার ওপর কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে,
সে হঠাৎই উড়ে গিয়ে—
জাম গাছটায় বাঁধা দোলনার ওপর বসে।
যে তাকে সঙ্গ দিতো নিঃশ্বাসের মতন,
তাকে খোঁজে পাখিটা।
রোদ ফুরিয়ে আসা বিকেলে,
তেতুলিয়া নদী থেকে উঠে আসা বাতাসে;
দোলনায় দোলে বেনেবউ পাখিটা।
নতুন বউয়ের নাকফুল দোলনায় পড়ে থাকতে দেখে;
নাকফুলটা পরম যত্নে ঠোঁটে চেপে ধরে সে।
বুকের ভেতর তার আথালিপাথালি ঢেউ,
তেতুলিয়া নদীতে সে আর আসবে না কখনো;
জলে ঝাঁপুড়ি খেলে ভেজাবে না তার পালক।
নাকফুল ঠোঁটে চেপে সে উড়াল দেয় লবণ সমুদ্রে।
গৃহস্বামীর সকরুণ দৃষ্টি মেঘের রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়,
তার চোখে বাষ্পের বুদবুদ।
কদিন ঘরটা শূন্য ছিল, অতঃপর ভেতর আর বাহির সমান শূন্য বলে মনে হয় তার।

উলটো পথে

ভাবনার দেয়ালে সুতো কাটা ঘুড়ির মতন প্রেম লটকে থাকে,
অনুভূতির মই বেয়ে বেয়ে তাকে ধরতে চেয়েছি কতবার;
ধরা না দিয়ে শূন্যে ভেসে ভেসে হয়েছে সে নিরুদ্দেশ।
নদী খুঁজতে খুঁজতে চোখের কাছে এসে দেখি,
মেঘ তাকে অনেক দিন আগেই কিনে নিয়েছে লাখ টাকায়।
কেউ আমাকে বলেছিল, 'তুই ভালো দেখে একজোড়া ঠোঁট খুঁজে নিস।'
শীতে-কুয়াশায় দিব্যি সকাল-বিকেল রোদ পোহাবি সেখানটায়,
একজোড়া ঠোঁটের জন্য ঘরছাড়া হলাম আবার;
নিঃশ্বাস বন্ধক রেখে একজন আমায় একজোড়া গোলাপি ঠোঁট দিয়ে বলেছিল,
'আমার মতন পাগল নাকি সে এ জীবনে আর একটিও দেখেনি।'
কৃত্রিম ফুসফুসে কত কষ্টে নিঃশ্বাস নিই,
কিন্তু সে ঠোঁট জোড়া কত যতনে আগলে রাখি।
কিছুদিন পর এক পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা,
গোলাপি ঠোঁট জোড়া দেখে আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলল,
'তুই কী বোকা রে, একবারও দেখলি না এই ঠোঁটে কত চুম্বনের ছাপ,
হৃদয় বেচে কেউ বারোয়ারি ঠোঁট কেনে আজকাল!'
উত্তরে বলেছিলাম, 'কেউ কেনে না বুঝি?'
বন্ধু বলেছিল, 'ঠোঁট নয়, তুই বরং একটা টিপ কিনে নিস;
টিপ বেশি কুমারী থাকে।
চাঁদের মতন দেখতে হবে,
অষ্টপ্রহর জ্যোৎস্না দেবে।
টিপ হলো সতিনকাঁটা,
টিপ কিনে আমি হারালাম চাঁদ।
তিল ঢেকে যাবে এ কারণে
টিপ সে আর পরে নাকো।
আথালিপাথালি জলের মোচড়,
বুকের ভেতর আছড়ে পড়ে।
ঠকে ঠকে জিতে আবার,
কেন বারে বারে হেরে যেতে হয়?

রুমালি মন

রুমালি রুটির মতন তোমার মন,
হালকা আঁচেই তা পুড়ে পুড়ে যায়।
কত সাবধানে তারে উলটায়-পালটায়,
কী ভীষণ যত্নে তাকে রাখি;
বাজপাখির ঠোকর থেকে বাঁচাতে তারে নিজে হই রক্তজবা।
কতটা সময় নিয়ে সে মনের কার্নিশ, ঝুল বারান্দা, অলি-গলি ঝাড়পোছা করি,
কী পরম মমতায় সেখানে পাহাড়ি মেঘ ডেকে আনি।
তার আঁকাবাঁকা খাঁজে থরে থরে আসবাবের মতন সাজিয়ে রাখি নোনা কষ্ট, দলা পাকানো দীর্ঘশ্বাস, এক আকাশ নীল বেদনা।
অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল তোমার মনের মাঝ বরাবর হব জলঢাকা নদী।
দিনে-রাতে বয়ে যাব,
বাতাসের কানে কানে
ঢেউয়ের শরীরে;
হলদে আলোয় অব্যক্ত গুঞ্জন তুলে হব ঝড়ের পূর্বাভাস।
তুমি তো খবর রাখো না অমাবস্যার,
জানো না ঘোর অন্ধকারে কেমন করে বেঁচে থাকে ভালোবাসা।
আমি জানি জোয়ার-ভাটায় কতটা ভেজে কিংবা শুকোয় তোমার মন।
পুতুল প্রতিমা তো নও,
চোখের মণির মতন নড়ে-চড়ে বেড়াও সারাক্ষণ।
কতজন বলে কী খুঁজিস ঐ মনে?
শাদা কংকালের মতন যে মরে গেছে মৌর্য যুগেরও বহু আগে।
যার চারপাশে পূতি কর্পূরের ঘ্রাণ,
আমি তাদেরকে বলি—'মন কখনো মরে না।'
বেনেবউ পাখির মতন আকাশের জলজ মেঘে তা ভেসে বেড়ায়।
ওরা জানে না লেবুর পাতা কচলালে যে মিষ্টি সুগন্ধ হয়;
তোমার মনে সে সুগন্ধ সারাক্ষণ উড়ে উড়ে বেড়ায়।
কী ভীষণ যত্নে তারে রাখি,
কী করুণ মায়ায় তারে বাঁধি;
আদরে আদরে, বেদনায় ব্যবচ্ছেদে।

অনাবিষ্কৃত সভ্যতার আদিপাঠ

করাতের মতন শরীর তোমার,
'সমিলের ম্লান রোদে লাশের মতন পড়ে থাকা কাঠের গুঁড়ি আমি।
নারী দেহের মতন উলটে-পালটে চেরো আমাকে,
উদোম গায়ে হানো বর্শার ফলা।
কাঠের গুঁড়োগুলো আগুনের ফুলকি হয়ে পোড়ায় মৃত্তিকার পুতুল প্রতিমা।
চিতার ভস্মে পোড়া পদ্মের মতন যোনির ঘ্রাণ,
তেতো মদের ঢেকুর বিষক্রিয়া ঘটায় বুঝি?
কড়কড়ে রোদে মৃত পাথর শিবলিঙ্গের মতন জেগে ওঠে।
গুহাচারী মানবকে তুমি শিখিয়েছিলে প্রথম ব্যাধের মন্ত্র—
সাপিনীর মতন তোমার উদ্যত কামনার তির,
খাড়া ঢাল বেয়ে সমতলে নামতে নামতে;
নিঃসঙ্গ কামার্ত সিংহের কেশরে বিদ্ধ হয়।
নিশাচর রাজপথ হঠাৎই দুগ্ধবতী পূর্ণিমাকে গ্রাস করে।

স্পর্শাতীত অনুভূতির কাব্য

সন্ধ্যারা আজকাল তোমার মতো করে খোঁপা বাঁধে,
বুনো অন্ধকার, সে খোঁপায় গুঁজে দেয়;
কয়েকটা আধফোটা ছাতিম ফুল।
চাঁদটা ইদানীং তোমার মতো করে হাঁটে,
মধ্যরাত অবধি শোনা যায় সে হাঁটার শব্দ।
দৃষ্টিভ্রম হয় কি?
তোমার শরীরের রেখা ইছামতির মতন আঁকাবাঁকা হলেও
অন্ধকারে তা শাপলার মতো ফোটে।
বেড়জাল দিয়ে অন্ধকার ঘিরে ফেললেও,
তুমি কীভাবে তুলোর মতো উড়ো জানি না।
জালানো খেজুরগুড়ের মতন গাঢ় মিঠে অন্ধকারে;
জ্যোৎস্নারা তোমার কানের দুলের মতন নড়ে,
নড়ে নড়ে তারা জলের মতন একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়।
শামুকের শরীর তোমার
জল-কাদায় দিব্যি হেঁটে চলো;
আমাকে সঙ্গে নেবার কথা বললে,
খোলসের ভেতর ঢুকে যাও।
নোনতা হৃদয়, সমুদ্রের জলে ভরা।
ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠা আবেগ,
বরফের মতন ঠাণ্ডা।
অন্ধকারে তোমার মন আজকাল নড়েচড়ে ওঠে,
মাছ ধরা ছিপের কলের মতন তা ডুবে ডুবে কেমন করে যেন ভেসে ওঠে;
দৃষ্টিভ্রম হয় কি?

বেনামি চিঠি

শেষ রাতের টুপটাপ বৃষ্টি,
তাল গাছের বাকলে জমা জল;
গোলাপজলে ভেজানো শিউলি,
জাদুকাটা নদীতে ভাসমান কচুরিপানা;
এসব ছেড়ে আমাকে আসতে হলো,
অথচ এর কিছুই আমি ছাড়তে চাইনি।
একটা বেনামি চিঠির জন্য এত হুলুস্থুল
টালির চালাঘর,
জল খাবার পুরনো মগ,
চুল আঁচড়াবার শখের চিরুনি;
দাগ টানা কবিতার খাতা,
এমনকি সব সময়ের সাথে থাকা চশমাটা পর্যন্ত আমাকে ফেলে আসতে হয়েছে।
ভরা বরষায় মেঘদূত খোলা পড়ে রইল,
নির্ঘুম রাতের সাক্ষী হয়ে রইল এলোমেলো বিছানা।
প্রিয় ছবির অ্যালবাম ফেলে এলাম ভুলে,
অনেক দিন ধরে জমানো খুচরো পয়সা ভরতি,
একটা মাটির ব্যাংক আনা হলো না সাথে।
আর কিছু না হোক অ্যাশট্রেটা আনতে চেয়েছিলাম,
আনা হলো না কিছুই—
খালি হাত-পা নিয়ে বেরোতে হয়েছে আমায়,
ধরতে হয়েছে আলো ফুটে ওঠার আগের শেষ ট্রেনটি।
আমার জন্য কোনো নারীর আত্মহত্যা
কেমন বেখাপ্পা শোনায় বলুন তো,
আমি এতটা প্রেমিক কোনোকালে ছিলাম না।
সুইসাইড নোটে আমার নাম,
এও কি সম্ভব!
এই সেই উড়ো চিঠি,
যার জন্য আমাকে আসতে হলো,
কলমিফুলের জীবন ছেড়ে কোলাহলের এই শহরে।

প্রেমিক হয়ে ওঠার গল্প

কতবার তোমার দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে ফিরে গেছে লিলুয়া বাতাস
নিঃশব্দে উড়িয়েছে তোমার কুন্তল;
তুমি তা জানো না।
তোমার সুরমা চোখের আর আলতা রাঙানো পায়ের ছায়া যখন চন্দ্রপুলি দিঘির জলে পড়ে;
তখন কার্তিকের বিকেলে কুয়াশারা লাজুক পায়ে হেঁটে হেঁটে নববধূর মতো
পৃথিবীতে নামে।
তোমাকে লেখা চিঠি আর ডাকবাক্সে ফেলা হয় না,
তোমার জন্য জমানো কথা বলা হয় না;
তোমার জন্য রাখা বিকেলগুলো তোমাকে দেওয়া হয় না।
তোমার স্মৃতির কৌটো সিন্দুকে সযত্নে তোলা হয় না।
তোমাকে ভাবব না বলে মনস্থির করে যে মন,
সে মন তোমাকে ভেবেই নষ্ট করে অষ্টপ্রহর।
অথচ দেখো প্রেমিক হয়ে ওঠার জন্য এই শহরে আমাকে কত পরীক্ষাই না দিতে হয়েছে!
বেকার জীবনে কিনতে হয়েছে কত গোলাপ,
খুঁজতে হয়েছে কাঁকই, বেলকুঁড়ির মালা;
মেটাতে হয়েছে কত রিকশা ভাড়া, চিনাবাদাম, ফুসকা আর চটপটির বিল।
কিন্তু যখন আমি এসব কিছু উতরে গেছি,
কড়কড়ে রোদে দুপুরে শুধু জল খেয়ে বাঁচতে শিখেছি;
ঝুম বৃষ্টিতে কাকভেজা হতে শিখেছি,
যখন আমি হেলাল হাফিজের মতো প্রেমিক;
তখন আমার মনে হয়েছে আমি তোমার জন্য নয়, আমি কুসুমদির জন্য মরতে পারি।
বিশ্বাস করো তোমার মাঝে তাঁকেই খুঁজেছি বারবার।
তোমার চিবুক, করতল, সকাতর চাহনি, শাড়ির কুচি এসবে কি আমি খুঁজিনি তাঁকে?
আমি কি বলিনি তোমাকে এ শহরে আমি কুসুমদির জন্যই নিখুঁত প্রেমিক হতে চেয়েছি।
এ শহরের সকল যন্ত্রণা আমি কুসুমদির জন্য মেনে নিয়েছি,
তাঁকে পাব না বলেই আমার এই যন্ত্রণা উদ্‌যাপন ভালো লাগে।
আমি ঋণী তুমি আমার স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিয়েছ।
আমাকে প্রেমিক হওয়ার সুযোগ দিয়েছ,
হেলাল হাফিজের জীবন বেছে নেওয়ার সাহস জুগিয়েছ।
সব প্রেমই প্রেম কিন্তু সব প্রেমিক হেলাল হাফিজ নয়।

ধানি রোদের দিন

এই জলাময় নদী আর ইন্দ্রশাইল ধানে, কুমারী কৃষাণীর শ্যামল শরীর থরে থরে বিছানো।
ধানশালিক এসে উঠোনে ছড়ানো ধানে বিলি কেটে যায়।
সুগন্ধা হাওয়া আঁড়ে মেলে দেওয়া শাড়ি ছুঁয়ে রূপকথা হয়ে পুব জানালায় নাবে;
আসন্ন গোলাপোরা ধানের খবর তিলা ঘুঘু হাঁটুভাঙা বিলে উড়ে উড়ে বলে বেড়ায়।
ভেজা নীল মেঘ ধানি রোদে নীলচে আভা ছড়িয়ে যায়।
কুলায় উড়ে হেমন্ত বিকেল, ধান ও প্রেমের সওগাত নিয়ে;
সন্ধ্যামলতীর সাঁঝবাতি জ্বেলে,
কুমারী কৃষাণীর ঢেউতোলা বুকে স্বপ্ন নাবায় তরুণ কৃষাণ।

তোমাকে ছেড়ে দিলেই যদি

তোমাকে ছেড়ে দিলেই যদি ভালোবাসার ঋণ শোধ হয় তবে তুমি যাও,
আজ থেকে মুক্ত।
আমি ভুলে যাব কাঠগোলাপের দিন,
বৃষ্টিভেজা চোখের পাতায় চুমু খাওয়ার কথা।
ভেবে নেব,
একটা কালো টিপ আমার জন্য কেউ কখনো পড়েনি।
মধ্যদুপুরে কারও বুকে কোনো বিরহ ব্যথা বাজেনি।
ছাদের কার্নিশে আমি কাউকে জড়িয়ে ধরে বলিনি,
'তোমার ঠোঁটে এত জ্বর কেন?
লবণের মতো স্বাদ।'
আমি বুঝে নেব,
হলুদ খামের চিঠিগুলো মিথ্যে।
নির্জন লাইব্রেরিতে পলের পর পল তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অর্থহীন।
আমি জেনে নেব কেউ আমার ছিল না,
আমি কারও জন্য বিশ হাজার বিকেল অপেক্ষা করিনি।
কেউ আমাকে ছোঁয়নি,
আমার রোমকূপে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো টগবগ টগবগ করে কেউ কামনার আওয়াজ তোলেনি।
আমি ভুলে যাব,
চুলে বিলি কাটার ক্ষণ, চালতার ফুল, লালপেড়ে শাড়ি,
তোমার আঁকাবাঁকা সিঁথি, দোলনার শরীর।
ভুলে যাব প্রথম চুম্বন, থরথর করে কাঁপা ঠোঁট, রোববার সকাল, শুক্রবারের কুয়াশা রাত, বারান্দার বৃষ্টি, তেতলার নির্জন ঘর।
আমি কি ভুলে যাব
হুডতোলা রিকশার দুপুর,
আল মাহমুদের 'বুনো বৃষ্টির ঘ্রাণ'
মদের মতো গেলাস গেলাস ভর্তি কবিতা;
অথবা তোমার পায়ে কড়ে আঙুলে চুমু খাওয়ার ক্ষণ?

অভিযোগ

আমি তোমাকে ভালোবাসি না বলে তোমার যে অভিযোগ তা আমি অকপটে মেনে নিই।
কারণ আমি তো কখনো একটা গোলাপ বাগান তোমাকে দিইনি,
কিংবা একটা সাম্পানে চড়ে তোমার চোখে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে পার হইনি ভরা কর্ণফুলি।
তোমার নাম করে বায়েজিদ বোস্তামির মাজারে হলুদ-লাল সুতোয় বাঁধিনি তাবিজ।
সন্ন্যাসী হইনি,
দেবদাসের মতো পারুর দুয়ারে এসে স্বেচ্ছামৃত্যু জীবন বেছে নিইনি।
তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই মানুষ হিসেবে আমি যতটা ভালো প্রেমিক হিসেবে ততটাই নিম্নমানের।
তাই তোমাকে না-ভালোবাসার সত্যটা আমি এড়াতে পারি না,
সব প্রেমিক পূর্ণেন্দু পত্রীর মতো প্রেমের কবিতায় অমর হতে পারে না।
ধানমন্ডি লেকে, জাতীয় নাট্যশালায়, সিনেকমপ্লেক্সের প্রিমিয়ার শোতে, হুডতোলা রিকশায় ঠাসাঠাসি করে বসা,
খোসা ছাড়ানো বাদাম একটা একটা করে কোমল হাত থেকে তুলে খাওয়া, কদম হাতে সারা দিন বৃষ্টিতে ভেজা;
কিংবা আলতা পায়ে নূপুর পরানোর স্মৃতি সবার থাকে না।
সব প্রেমে 'দোতলায় ল্যাডিং' কবিতার মতো মেয়েটা বলে না, 'আপনার হলুদ শার্টের মাঝখানের বোতামটা নেই লাগিয়ে নেবেন।'
ছেলেটাও চটজলদি উত্তরে বলে না, 'সন্ধ্যায় ওভাবে পড়বেন না চোখ যাবে।'
আমি তোমাকে ভালোবাসি না এ অভিযোগ আমি মেনে নিই,
কারণ আমি তোমার শাড়ির কুচি দেখার চেয়ে মনে রাখি তুমি সকালে ওষুধ খেয়েছ কি না।
তোমায় বেলকুঁড়ির মালায় ভালো দেখায় এ কথা বলতে ভুলে যাই অথচ তোমার ডান পায়ের কড়ে আঙুলের চোট ভালো হয়েছে কি না তা বারবার জিজ্ঞেস করি।
তুমি ঘুমোলে ফ্যান ছেড়ে দিই, মুখে রোদ লাগলে জানালার পর্দা টেনে দিই,
স্নানের জন্য জল ভরে রাখি।
আমি তোমাকে ভালোবাসি না এ সত্য মেনে নিই,
আমি ভুলে যাই পনেরোই মে, ছয় আগস্ট, তেরোই ডিসেম্বর।
অথচ তুমি অন্ধকারে ঘুমাতে পারো না জেনে সারা রাত ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখি।
তুমি খেয়েছ কি না জানতে চেয়ে ভাত মুখে তুলি;
তোমার অজান্তে তোমার ফটোফ্রেমের ছবির ধূলি মুছি।
তোমাকে ভালোবাসতে পারি না এ অপারগতা আমার,

পূজার ছুটিতে পাহাড়ে, চা-বাগানে, সমুদ্রে যাই না।
রান্নাঘরে তোমার কপালে লেপটে থাকা ঘাম দেখি না।
বাতাসে তোমার চোখের ওপর উড়ে আসা চুল দেখি না,
কী আয়োজন করে টিপ পরো অথচ ভুলেও বলি না,
'টিপে তোমাকে দারুণ মানায়।'
কিন্তু হেঁচকি উঠলে জলের গেলাস ভরে এগিয়ে দিই,
শীতে ঠাণ্ডা লাগবে বলে উত্তরের জানালা বন্ধ করে দিই।
কবিতা পড়ি না তবুও তোমার জন্য রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কিনি।
চা বানিয়ে বারান্দায় বসি,
বিকেলের ছায়ায় অপেক্ষা করি।
মনে মনে একসাথে বৃদ্ধ হওয়ার কথা ভাবি।
তোমার অভিযোগ মেনে নিই,
কারণ ভালোবাসার সংখ্যাতত্ত্বে আমি আশির চেয়ে শূন্যতেই তোমাকে পেয়েছি বেশি।

হাওয়া এসে বলে যায়

বাতাসের ওড়নায় আজকাল তোমার মুখ ভাসে।
মুঘল হেরেমের কলতান ছাপিয়ে,
তোমার গোলাপি গালে যমুনার ঢেউ ওঠে।
এক একটা খত নির্জন রাতের সাক্ষী;
যা লিখতে হৃদয়কে তরমুজের ফালির মতো কেটেছ তুমি।
তা আমার কাছে পৌঁছাত কোনো কোনো বিরহী দুপুরে গোলাপের সুবাস নিয়ে।
তোমার চোখের কাজলে আটকে থাকা মন,
ফেরত চাইতে গিয়ে তোমার বুকের নিঃশ্বাস হয়ে বন্দি হব ভাবিনি!
দিল্লির জামে মসজিদের শ্বেত পায়রারা জানে,
কুতুব মিনারের গায়ে হেলে পড়া সূর্যের লালচে আভা জানে;
লালকেল্লার দরজা, জানালার খিলান জানে,
সারা দিন দিল্লির রাস্তায় ঝরঝর করে ঝরে পড়া বৃষ্টি, চুড়ি পট্টি, যমুনার পার,
দিওয়ান-ই-খাস, নিঃসঙ্গ তাজমহল জানে তুমি প্রেমে পড়েছ।
মির্জা গালিব জানে না সে প্রেমের খবর।
অথচ দিল্লির অলিতে-গলিতে গালিবের 'শের' তোমারই প্রেমের কথা বলে যায় অকপটে।
ঘোড়াগাড়ির সওয়ারী, কোচোয়ান, পথচারী, দুধওয়ালী, উঠতি কবি, নবীন
অধ্যাপক সে 'শের' আওড়ে তোমার গোলাপি গাল কল্পনায় রাঙিয়ে তোলে।

বিপরীত

অনেক দিন তোমাকে দেখি না বলেই,
আমি সন্ন্যাসী হয়েছি এ কথা মনে কোরো না;
আমি সন্ন্যাসী হয়েছি মূলত তোমাকে খুঁজব বলে।
আমি সূর্য হয়েছি বলে তোমার চোখের কাজল দেখি না এই তথ্য সঠিক নয়।
আমি ডুবে গেলে,
পরদিন তোমার চোখেই নতুন সকাল হই।
আমাকে ঢের দুঃখ দিয়েছ ভেবে তুমি যদি চুপ থাকো,
তবে জেনো তোমার নীরবতা তার চেয়েও ঢের কষ্ট দেয় আমাকে।
যারা বলেছে আমি তোমায় ছেড়ে গেছি,
তারা বিরহতত্ত্ব বোঝে না;
দুই চোখের মাঝখানের দূরত্বকে বুঝি ছেড়ে থাকা বলে?
চোখ খুলে তোমাকে দেখি যত,
চোখ বন্ধ করে কি দেখি না তত?
তুমি আমার মনে নেই এ কথা যারা রটিয়ে দিয়েছে,
মন পড়ার বিদ্যেয় তারা আনাড়ি।
তারা জানে না স্রষ্টার মতো এ মনে তোমারও অবাধ আসা-যাওয়া।
খিল তো আমি তাদের ভেবে দিই,
তোমার জন্য হাটখোলা দিল।
তোমাকে আমি দেখি না—এই কথা যারা বলে,
তারা তোমায় বিভ্রান্ত করে।
প্রেম কি শুধু দেখাতেই হয়?
আমি তোমাকে না দেখে জেনেছি,
যেভাবে আমি ঈশ্বরকে চিনেছি।

মেঘলা মানবীর কাব্য

কিছু রজনিগন্ধা না হয় থাকুক ফুলদানিতে,
এ মেঘলা বৃষ্টির দিন ঘর ভরে উঠুক তাতে;
আজ আকাশটা বারান্দার কাছে আসুক।
তোমার যে চোখ ভুবন চিল খুঁজে ফেরে,
তার গহিনে বৃষ্টির গান; মনের বীণায় অলস দুপুর নির্ঘুম সুর তোলে পদ্মদিঘির ঘাটে।
খোলা চুলে যে বন্য হাওয়া চাঁদের আলো নিয়ে আসে অন্ধকার হাতড়ে; ডুবুরি
জ্যোৎস্না সে আলোকে করে আলিঙ্গন। বৃষ্টিতে ভেজে তোমার কপাল; চোখে নামে
যমুনার ঢল।
এমনই দিনে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে উড়ো চিঠি আসে,
কালির ভাঁজে ভাঁজে সঘন আহ্লাদে জড়ানো আমন্ত্রণ।
অদেখা মুখোচ্ছবি রেখায়িত হয়ে বিন্দুতে এসে, আবেগকে জড়িয়ে একে একে
ভাঙতে থাকে হৃদয়ের পার।
কিছু কামিনী না হয় থাকুক খোঁপায় আজ;
বিষণ্ন মন ভরে উঠুক তাতে।
অপেক্ষারা না হয় বন্দি থাকুক চোখে;
আশাটুকু না হয় এ বেলায় বৃষ্টিতেই আরও ভিজুক।

ভালোবাসি, একবার বলে দেখো

ভালোবাসি, একবার বলে দেখো—
সমান্তরাল রেললাইন হয়ে কীভাবে পৌঁছে যাই তোমার মনের জংশনে।
তুমি বুঝতেও পারবে না কুয়াশা বৃষ্টি হয়ে কেমন করে ভেজাই তোমার স্মৃতির উঠোন;
তোমার আঙুলের ডগায় যে গোলাপের ঘ্রাণ তুমি বয়ে এনেছিলে বসরা নগর থেকে
মাঘের শিশিরেও সে ঘ্রাণ কত টাটকা!
ভালোবাসি, একবার বলে দেখো—
রোদ ভেঙে ভেঙে কেমন করে পৌঁছে যাই তোমার ওড়নার ছায়াঢাকা ধানসিঁড়ির ঘাটে।
নারকেল ফালির মতো ঠোঁটের গুঞ্জন যা রবীন্দ্র সংগীতের মতো শোনায়—
জীবনানন্দ দাশের শঙ্খচিল কি জানে কতগুলো মেঘের পরতে পরতে ছড়িয়েছে সে সুর?
ভালোবাসি, একবার বলে দেখো—
কথা দিচ্ছি সমুদ্রের মতো সাহসী হব,
ঝড়, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে হব শান্ত তটভূমি।
দশটা টু পাঁচটার অফিস টাইম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কেরানিজীবন বদলে নেব
কবির সাথে।
নিয়মিত চিঠি দেব ডাকবাক্সে,
হাতঘড়ি পরতে ভুলব না;
পোস্টম্যান এলো কি না খোঁজ নেব সকাল-বিকাল।
ভালোবাসি একবার বলে দেখো—
তোমার রোদমুখে কেমন করে ছায়া হই,
ছাদের কার্নিশে কেমন করে হই ঝুলন্ত চড়ুই;
তোমার যে হাত ঝিনুক হয়ে সমুদ্রে ভেজে তার মুঠোয় কেমন করে হই জলজ ফেনা!
ভিড় ঠেলে কেমন করে মেট্রোতে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যাই!

জলজীবনের ছবি

যে দীপ জ্বলার কথা ছিল ভোর না হওয়া অবধি,
যার দীপাধার আলো করে চারপাশে আলোর মিছিলের গুঞ্জন তোলার কথা ছিল।
তা নিভে গেলে কেমনতর ঘন আঁধারে বাঁচে মানুষ?
ঘোলা জলে মাছেরা তড়পায়;
শামুক হেঁটে হেঁটে জলে নামার আগে রোদের শাড়ি খুলে ডুবিয়ে দেয় গতর।
ডিঙি নাও জলের ওপর দোলনার মতন দুলে দুলে ঘুম জড়ানো চোখে উপকূলে ভেড়ে;
লইট্যা শুঁটকির আঁশটে গন্ধে উবে যায় আতরের ঘ্রাণ।
মাছের ব্যাপারী শেষ কবে আতর মেখেছিল গায়?
পত্তনি জাল, বিহিন্দি জাল বেয়ে যারা অগভীর সমুদ্রে মীনশস্য শিকার করে;
তারা জানে আড়তদার আর ব্যাপারীর মতো মানুষেরা মদের আর নারীর গন্ধ ভালোবাসে।
কূলে পুরুষ পরীযায়ী মাছ না পেয়ে বিষণ্ন মুখে ফিরে গেছে ডিমে তা দেওয়া স্ত্রী পাখিটির ডানায়।
খাবারের অনিশ্চয়তা, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারে চিন্তামগ্ন না থেকে সে তার শ্বেত শরীর পালকের লেপে পরম যত্নে গলিয়ে দেয়।
জলজীবীরা জানে এ তল্লাটের মানুষের প্রেমে জলের সংগ্রাম নেই, আছে ভোগের উদগ্র নেশা।
তারা জানে মাছ ও মানুষের নিরাপদ জীবনে পোড়া ডিজেলের গন্ধের সঙ্গে টাকার গন্ধের কী অদ্ভুত মিল।
একদা মাছের গন্ধে তারা মৃতের মতো ঘুমাত, এখন টাকার গন্ধে রাতের জোছনাকে তাদের কাছে এক একটা আধুলি মনে হয়।

মাধুকরী

মনের ভিতর ফেনায়িত ঢেউগুলি যদি কথা বলতে পারতো, তবে তুমি শুনতে
পেতে তার শব্দ।
তুমি জানো না কী তীব্র অনুভবে সে ঢেউ হয়ে আঁছড়ে পড়ি তোমার ঝিনুক শরীরে।
ভালোবাসি, শব্দটা নিঃশ্বাস নেবার মতো করে প্রতি সেকেন্ডে বলি তোমায়,
তবুও দ্যাখো কতো শতাব্দী ব্যবহারেও এ শব্দ পুরনো হয় না।
এই যে বাতাসে তোমার চুল খসে পড়ার মর্মর ধ্বনি,
তোমার হাতের স্পর্শের মতো শিহরিত ভোর;
লজ্জাবনত চোখে রাতের পিপাসা,
ঠোঁটে গোলাপ ফোটার ক্ষণকে দীর্ঘায়িত করে।
আসলে প্রেমে একক নির্মাণ বলে কিছু নেই,
সব প্রেমিক মূলত মাধুকরী।
তোমার সবটুকু সৌন্দর্য পৃথিবীময় খুঁজে ঈশ্বরকে বলেছিলাম,
'স্বর্গের অস্পরী চায় না;
আমাকে একজন কুসুমদি তৈরি করে দাও,
যার শালিকের মতো নরম বুকে কলকল করে বয়ে চলার জন্য শঙ্খী নদী করে দাও।
থুতনিতে রোদ করে দাও,
নূপুরের শব্দ শোনার জন্য তার চারিপাশের বাতাস করে দাও।

সবিনয় নিবেদন

জ্যোৎস্না বলে যে আমার কাছে অমাবস্যা বেচে গেল,
আমি অনেক দিন ধরে তার জন্য মহুয়া ভোর নিয়ে বসে আছি।
প্রতিদিনই বয়ে চলা ছতনাই নদী জানে,
কুয়াশা কতটা ঘন হলে জলস্রোত আর দেখা যায় না;
জলের রেখা মুছে গেলে চাঁদের আলো জমে জমে তার চোখ হয়ে ওঠে বসরাই গোলাপ।
আমি তারে খুঁজি যে আমাকে ফাল্গুনী রোদ নিয়ে হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাওয়া বরফ দিয়ে গেছে।
একটা টি টি পাখি তোমার স্বরে ডেকে যায়,
ডাকবাক্সের চিঠি আসে, হলুদ খামের মতো আসে নিঃশব্দ দুপুর।
কাঠঠোকরার মতো বুক চেরার শব্দে আরও ভারী হয়ে ওঠে তোমার নিঃশ্বাস।
পথে পথে হাজারো মৃত্যুর কফিনে নোনাজলের নোনা চিহ্ন,
চিমনির ধোঁয়ায় তোমার মুখ অস্পষ্ট রেখায় মুছে যেতে যেতে তা চাঁদের মতো ক্ষীণকায় হয়ে ওঠে।
আবারও মুকুলস্তনভারে নত হয় গাছ;
জল নিতে আসা যুবতীর কোমরে ছতনা নদীর বাঁক রেখায়িত হয়।
যে আমাকে মেঘ দেবে বলে কিছু শিমুল তুলো ধরিয়ে দিয়েছিল;
আমি ছতনাই নদীপারে হৃদয়াকাশ নিয়ে তার জন্য বসে থাকি।

বৃষ্টিতে ভেজার দিন

যে ওড়না কখনো বৃষ্টিতে ভেজেনি, আজ তারও বৃষ্টিতে ভেজার দিন।
নূপুর আজ সুর তুলবে বৃষ্টির মতন;
তুমুল বৃষ্টির বোলে রিনিঝিনি স্বরে কথা কয়ে উঠবে লাল কাচের একগাছি চুড়ি।
ভাতশালিকের পালক ভিজবে আজ;
তার ডানায় পাওয়া যাবে আগামীর রোদ দিনের খবর।
সজনে পাতারা সারা দিন ভিজবে আজ,
শ্যাওলা পুকুরে ঘোলা জল বয়ে আনবে কচুরিপানা।
আড়ে মেলে দেওয়া শাড়ি ভিজবে;
নারী ভিজবে জল বুদবুদে।
ঝড়ো বাতাসে কামিনী দুলবে, জলের তোড়ে কদম ভিজবে।
আজ বৃষ্টি কড়া নেড়ে যাবে যার দুয়ারে মেঘ জমে আছে,
বারবধূ যে উঠোনে নামেনি,
এ বৃষ্টি তার ভেজাবে শরীর;
বিরহী সে হবে বিনোদিনী।
যে মন কোনো দিন ভেজেনি বৃষ্টিতে,
আজ সে মন ভেজার দিন।

বেঁচে থাকুক আমাদের ভালোবাসা

গাঙচিলের ঠোঁটে,
তার খয়েরি ডানায় নরম পালকে ভেজা রোদের ভাঁজে;
অনন্ত সকালজুড়ে বেঁচে থাকুক আমাদের ভালোবাসা।
লবণ সমুদ্রের বুকে;
ফেনায়িত জলরাশিতে,
ঝিনুকের হৃদয়ের মাঝে বেঁচে থাকুক ভালোবাসা।
নীল দিগন্তের কোমল হাতছানি,
ভেজা চাঁদের হলুদ ইশারায়;
শিরিষ বনে নেমে আসা জ্যোৎস্নারা জেনে যাক—
মেঘনার জলের মতন এখনও ফুরোয়নি ভালোবাসার দিন।
টুপটাপ ঝরে যে বৃষ্টি,
চেতনার কার্নিশে, বারান্দায় যে চড়ুই প্রতিদিন রোদ পোহায়;
আনমনা হাওয়া অবিন্যস্ত করে যে চুল,
যে ছায়া জানালার গারদে ঢুকে বাম বুকে শীতল পাটি হয়ে বিছায় হাত-পা;
সেখানে বেঁচে থাকুক আমাদের ভালোবাসা।

মিছেই খুঁজে ফেরা

তোমার মন কি হীরামন পাখি?
যত খুঁজি তারে ততই সে হারায় রূপকথার দেশে।
চিত্রা নদীর পার হতে শুরু করে হাকালুকি হাওরের জল;
কোথাও তো দেখি না সে মুখ।
মিঠে রোদে তারে একবার দেখি তো ছায়ায় লুকায় বারবার।
বাগদাদের আতরে তুমি নাই, বসরার গোলাপে তুমি নাই;
মমতাজের বেশরে তবে কি তুমি আছ কত-শত যুগ ধরে?
জ্যোৎস্নাপিয়াসী চাতকের ডানার কাঁপুনিতে খুঁজেছি তোমায় রাত গভীর হলে;
সেখানে শূন্য আকাশ আর বিরহী নদী ছাড়া কিছুই পাইনি আমি।
কাচের জানালার ওপারে মেঘের বাষ্প;
তারও ওপারে পাতাঘর আর চিনিগুঁড়া বৃষ্টির রাজ্য সেখানে পাহাড়ি চাঁদ হয়ে
খুঁজেছি তোমায় নীল আলোর ভেতর।
তোমার মন কি বদল করেছ কঙ্কাবতীর সাথে?
নাকি ফেলে এসেছ তারে ঘোড়াশালে, ঘোড়ার কেশরে?
পালকির পর্দার আড়ালে সে মুখ নাই; জলসাঘরের ঘুঘুরে সে মুখ নাই; রূপোর
রেকাবির কামিনীতে, সুরমাদানির সুরমাতেও তা নাই।
আলেয়ার মতো তারে মিছেই খুঁজে ফেরে এ কোন রাজকুমার?

হরিণচোখ

একটা হরিণচোখ যে আমাকে পাহারা দেয়,
আমি যখন সাঁতরে পার হই ঘাঘট নদী।
অবেলায় ডাকপিয়ন এসে যখন দিয়ে যায় তার চিঠি;
সে চিঠিতে থাকে তার খোঁপার ফুল, নাকের বেশর আর আলতা কেনার খবর।
চিঠি খুলতেই সে হরিণচোখ আমাকে ডেকে বলে,
'ঘাঘট নদীতে বৃষ্টির মতো জোছনা ঝরে,
তুমি আসবা না? সেই নদীতে নাও নিয়ে আমার সাথে ভাসবা না?
পরানের ভিতর ঘুমাইয়া খোয়াব দেইখ্যা আমার বুকে রাখবা না মুখ?'
আমি তো তারে কবেই বলেছি,
আমার একলা জীবন মেঘের মতো বাতাসে কেবল ওড়াউড়ি করে।
এ কথা ঘাঘট নদীর জল জানে;
জানে পারের কাশফুল আর মুনিয়া পাখির দল।
তার চিঠির অক্ষর ঘন কুয়াশার বিকেল,
যা তার কলমিফুলের মতো মুখকে করে রাখে আড়াল।
সে মুখ দেখার জন্য চাঁদকেও অপেক্ষা করতে হয় রাত নামা অবধি।
একটা হরিণচোখ আমাকে দেখে,
যখন আমার কর্মব্যস্ত লেখার টেবিলে কফিমগে ধোঁয়া ওঠে কিংবা,
মোমবাতির মতো আমার অনুভূতিরা কলমে গলে গলে
হয় ঘাঘট নদী, হিজল ফুল।
তারারা তাঁকে দেখে,
তার হরিণচোখ তারাদের চেয়ে সুন্দর—এ কথা আমার কলম লিখলে সে বলে,
'কলম তার সতীন।'
সে আমাকে আয়নায় দেখে, অথচ আমি আয়নায় তাকে দেখতে চাইলেই সেখানে
দেখি ঘাঘট নদীর ফেনায়িত ঢেউ।
সে ঢেউয়ের দোলায় তাঁর হরিণচোখ ডোবে আর ভাসে।
সে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বলে,
'তুমি আমার মাধব হবে?
ঘাঘটের জলে তোমায় নিয়ে কাটব সাঁতার দিনমান।
আমার চঞ্চল মন বন্ধক রাখব তোমার কবিতার জন্য,
কথা দাও তুমি আমার হরিণচোখেই গড়বে বসতি।'

শোক

একটা মৃতদেহ ঘিরে এমন শোক এর আগে কেউ দেখেনি এ তল্লাটে।
করোনাকাল কান্নার শব্দ নিয়েছে শুষে;
দলাপাকানো হেঁচকি উঠে গলা অবধি এসে তা থেমে যায়।
ভালোবাসার মানুষ চলে গেলে আকাশও ছাইবর্ণের হয়।
ডাগর আঁখি তুলে আর সে দেখবে না ম্রিয়মাণ চাঁদ, শিরীষ পাতার ওপর রাতের শিশির।
সধবা নারীর স্বামীর মৃত্যুতে সে হয় বিধবা;
কুমারী প্রেমিকার প্রেমিকের মৃত্যুতে সে কি তবে শুধু বিরহী হয়?
নাকি শাদা কাফনের মতো তারও বুকে জাগে শাদা বালুচর?
যে দশ আঙুল একদা কথা বলত বিকেলের বাতাসে;
তা আজ বরফশীতল।
যে মুখ জ্যোৎস্নার স্নানে রঙিন তা আজ শিউলির মতন শাদা।
ফ্যাকাশে ঠোঁটে নেই সুচিত্রার হাসি,
এ তল্লাটে সবার শোক থেকে তার শোক আলাদা;
হাউমাউ করে কাঁদেনি সে, কিন্তু চোখে তার এক নদী জল।
বৈধব্যের শাদা শাড়ি সে পরেনি, কিন্তু শাদা আকাশ হয়েছে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।
এখন থেকে সে মেঘবাড়িতে থাকবে, মেঘের শরীরে আঁকবে তার শঙ্খমুখ।

কাঠগোলাপের কিছু কথা

তোমার জন্য কাঠগোলাপ রেখে গেলাম,
আর রইল টিপ টিপ শিশির ঝরার শব্দ;
একটা হলুদ খাম কিছু পরিচিত কালো অক্ষর থাকল ড্রেসিং টেবিলের ওপর।
মোমের আলোর সাথে রইল কিছু স্নিগ্ধ অন্ধকার,
রইল সোমেশ্বরী নদী, ঠাণ্ডা জল আর কবিতার মতো কিছু বৃষ্টি।
এই যে প্রতিদিন নাকফুলের মতো জোছনা ওঠে,
সে আলোর দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ।
ভারী পর্দায় ছড়িয়ে পড়ে দুপুরের রোদ;
বোবা ভাষা ঘুরে-ফিরে মরে,
তোমার জন্য থাকল মেঘ, থাকল নীলকণ্ঠ ফুল।
বুকের ভেতরে থাকল কিছু শব্দের গুঞ্জন,
চোখে থাকল কিছু অস্পষ্ট ইশারা আর চিত্রা নদীর পার।

সন্ধ্যানামা

জল কাঁপে তবুও তোমার মনে আমি স্থির রই,
এই যে রজনিগন্ধা রাত দুয়ারে এসে;
তোমার চুলে নক্ষত্রদের ঘুমানোর গল্প বলে যায়।
কী অবলীলায় জলের শরীরে সূর্য ভাসে,
ভাসে কলঙ্কের দাগ;
তুমি আমার ভাসাও সখী দুঃখ পরিতাপ।
সমুদ্রে তো ডোবে আকাশের নীল,
আমার হৃদয় নিয়ে উড়ে উড়ে চিল,
কী কথা বলে যায় তা হয় না জানা তোমার।
একটা কালো জলের সন্ধ্যা তোমার পা ছুঁয়ে নদীতে নামে,
অতঃপর সে সন্ধ্যা ও আমি পাশাপাশি বসি কিছুক্ষণ।
তোমার মুখে তারার স্নিগ্ধতায়;
শাহবাগের ফুলের রাজ্য,
আমার কলমে হাজারো কাব্য।
সবই হয়ে ওঠে তুমিময়।

জীবন তরঙ্গ

একটা শামুকজীবনই চেয়েছিলাম তোমার পাশে হাঁটার জন্য,
নোনাজলে কোমর অবধি ডুবে যেতে যেতে আমরা তটভূমির শেষ সূর্যাস্ত দেখতে চেয়েছিলাম।
সমুদ্রকে বলা হয়নি প্রেম আসলে জল ও জোয়ারে বেগবান হয়।
চাঁদও পারে মৃত ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিতে,
অথচ আমরা কি পেরেছি এক নিঃশ্বাসে বলে দিতে—'তোমাকে ছাড়া আমার এক পল চলবে না।'
ভালোবাসার প্রতিশ্রুতিরা বাঁচে প্রচুর আলোর ভেতর ডানা মেলে;
বিষের পাহাড় বুকে জমিয়ে সেখানে ছাতিম ফোটানো যায় কি বলো?
একবার ভালোবেসে যে নদী হয়,
সারা জনম তাকে চোখের জল বয়ে বেড়াতে হয়।
আমরা কি এমন নদী হতে চেয়েছিলাম?
এই যে ঘুমের ভেতর কুয়াশা এসে মৃতের মতো ঢেকে দেয় শরীর;
ঠাণ্ডা কপালজুড়ে হাওয়ারা খেলা করে,
দূরে আরও দূরে ধোঁয়া ছড়ানো আকাশ কী করে বিছানায়, বালিশে নেমে আসে তুমি জানো না।
পত্রপুষ্পহীন শিমুল গাছটায় একটা শ্বেত কাক তারস্বরে ডেকে যায়—
বলে যায়, 'এক জীবন প্রেমের জন্য,
আর এক জীবন মৃত্যুর তরে প্রস্তুতি নিতে ফুরিয়ে যায়।
ধানের মতো আর তারে গোলায় তুলে সযত্নে করা যায় না সঞ্চয়।'
তবুও আমরা নীল হয়ে,
দিগন্তে দিগন্তে প্রসারিত করতে চাই বাহু।
পদ্ম হয়ে ফুটতে চাই,
প্রেমকে শামুকের বুকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই অনাদিকাল।

প্রমাণিত ভালোবাসা

এই যে চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো তোমাকে মুখস্থ করি,
গণিতের সূত্র ভেঙে ভেঙে তোমাকে সহজ করে বোঝার আকুলতা আমার শেষ হয় না।
যারা প্রেম মানে মনে করে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন,
কিংবা কফিশপে কোল্ড কফিতে চুমুক;
অথবা শীতসন্ধ্যায় একটা চাদর ভাগাভাগি করে নেওয়া।
আমি তাদের থেকে ঢের পিছিয়ে।
আমি তো বুঝি,
তোমার উপস্থিতি মানে চোখে চোখে অনুভূতির রোদ বিনিময়;
একটা গুমোট সকাল হঠাৎই আলোয় আলোয় ভরে যাওয়া,
কোনো এক কাজল সন্ধ্যায় যে মেঘ নামবে নামবে ভাবছিল তার হঠাৎই ঝুপ করে বৃষ্টি হয়ে নেমে পড়া।
তুমি দৃশ্যত থাকো না, অথচ তোমাকে অনন্তে করি অনুভব,
এই যে ভাবের দুয়ারে তালা লাগিয়ে তোমাকে করে রাখি মেঘের আড়াল;
তুমি কি তা দেখো না—
তোমাকে মনে রাখি না,
এ কথা মনও বিশ্বাস করে না।
তোমাকে ভালোবাসি না,
এ কথা বললে বারান্দার নীলকণ্ঠ ফোটে না।
আমি চোখ বন্ধ করে তোমার মুখের ভাষা পড়ার বিদ্যে রপ্ত করতে চেয়েছি;
নদী বন্ধক রেখে তোমার চোখে ঢেউ গুনতে চেয়েছি।
তুমি মেনে নিয়েছ,
অন্ধ চোখ, যোগ গণিতের সূত্র, যোগ নীলকণ্ঠ ফুল সমান সমান প্রমাণিত ভালোবাসা।

অজানা গল্পের না পড়া পৃষ্ঠা

বুকের ভেতর পার ভাঙে তুমি শোনো না তার শব্দ;
মনে মনে নীল কাগজে কত কী লেখা হয়,
তুমি রাখো না তার খোঁজ।
জোছনায় আঁকা মুখ যা প্রেমের উপন্যাসের বিশেষ পাতার মতো বারবার পড়া হয়;
তবুও তার কিছু শব্দ, উপমারা ধোঁয়ার রেখার মতো রয়ে যায় অস্পষ্ট।
আমার দুঃখ থেকে যে কুয়াশা তৈরি হয় তুমি তার ভেতরে কীভাবে ফোটাও
গোলাপের কুঁড়ি?
থার্মোমিটারের পারদ কতটা উঠলে তাকে জ্বর বলা চলে?
তা তুমি সহজে বলে দাও,
অথচ কতটা শোক সয়ে সয়ে লবণচর জমলে বুকে ভালোবাসা হয় তা তুমি বলো না।
'ফুঁ' দিয়ে শিথানে তুমি তাবিজ রাখো;
তেমনি করে রাখো তোমার মন,
তাই তো সে মন ছুঁতে পারে না আবেগের পত্রালাপ।
ভাষা সেখানে রিনিঝিনি চুড়ি হয়ে তোলে না স্বর।
এই যে শীতরাতে,
শিশিরের জলের মতো তোমাকে নিয়ে জমা হওয়া গল্পের খোঁজ রাখো না তুমি;
রূপকথারা আজকাল রূপকথা হয় তোমার কথা ভেবে ভেবে।
তুমি তো তার রাখো না সন্ধান,
জিকিরের মতো ধ্বনিত হয় যে নাম;
ছবির মতো আঁকা হয় যার মুখ।
তুমি তো জানো না বোবার মুখে তুমি কথার কতটা ব্যাকুলতা,
কাজলের ভেতর পদ্মপাতার চোখ হয়ে ভেসে থাকা।

অনুরণন

ঝিনুক যে জলে ভাসে,
আমি তেমন জলে ভেসেছি তোমার মনে।
জেনেছি শুধু ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে পাওয়া যায় না;
দুঃখ দিয়েও তোমাকে ছোঁয়া যায়।
নদী দিয়ে যদি কেনা যেত চোখ,
তবে তোমার চোখের জন্য সোমেশ্বরীর মায়া ছেড়ে দিতাম।
যে রোদ বাতাস বয়ে আনে,
সে জানে না তোমার শরীরের ঘ্রাণ তাতে কাঠবাদামের মতো মিশে থাকে।
আমি স্রোত থেকে ফেনায়িত সাগর হয়ে দেখেছি;
তুমি তটভূমি থেকে ঢেউয়ে কীভাবে মিশে যাও।
যে তুমি জনরোলে ধরা দাও না,
শূন্যে সে তুমি জোনাকির মতো মিটমিট করো।
আলোর রেখা থেকে নক্ষত্র হয়ে ওঠো।
এভাবে মেঘ হয়ে তোমাকে দেখতে গিয়ে,
বৃষ্টিতে আমাকে ভিজতে হয়।
যে তুমি শীতরাতে আসবে না বলে মনে মনে মনস্থির করো;
সে তুমি কুয়াশায় কীভাবে স্পষ্ট হও।
দিঘি জানে কতটা জল জমা আছে তার বুকে,
কতটা ছায়া পড়লে তবে শীতল হয় তার শ্যাওলা ঘাট।
আমি জানি একটা আশ্রয় জমা আছে তোমার কাছে;
একটা ঘাট শীতল হয় তোমার ছায়া পড়ে পড়ে।

জল ও নারীর কাব্য

আকন্দলতা জানে,
সমুদ্রে ভেসে ভেসে যে জাহাজ নোঙর করেছে বালুকাবেলায়;
তার শরীরে শাড়ির মতো লেগে আছে সমুদ্রের কুয়াশা।
এটা রূপকথার গল্প নয় তবুও জেনে গিয়ে,
রাজকন্যা আসে না মেঘের পাখায় ভেসে।
জড়োয়া গহনা পরে রাজমহল করে না আলোকিত।
রাজকুমার ধুলো উড়ান না আর আগের মতো করে গোধূলিবেলায়;
হাম্মামের উষ্ণ জলে আতর ও চন্দনের সুবাস ছড়ায় না।
আকন্দের বেগুনি ফুলেরা জানুক,
নদী আজকাল আর নারী হয়ে ওঠে না,
উজানের জলে সে নারী বাঁধে না ঘর।
ভাটির দেশ থেকে সঙ্গে করে আনা মুখ আয়নায় ভাসে বারবার,
সে কি পায় কখনো চাঁদজীবনের খোঁজ?
জ্যোৎস্নার বসতি?
পাশাপাশি শূন্য নৌকায় ভাসে কি তার দেহ?
জলে সংসার পেতে সে কি রাখে নয়ন ভাটির পানে?
জীবন একবার তারে পায়, তবুও খোঁজে বারবার।
যে নদীতে স্রোত নাই, সে ঢেউ তোলে সেইখানে;
যেখানে সুখ আছে, সেইখানে সে দুঃখ হয়ে কথা কয়।
সে নারী থেকে নদী হয়ে ওঠে।

তোমাকে ভালোবাসি বলেই

তোমাকে ভালোবেসেছি বলেই এমন স্রোত হয়ে ভাসা,
তোমাতে ভাসব বলে কত নুড়ি পাথরকে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াই তুমি তার সন্ধান রাখো না।
কত বৃষ্টির জল এসে মেশে আমাতে,
কত পাখির ডানার ছবি আঁকা হয়;
তবুও তোমাকে পাওয়া হয় না তাদের মতো।
এতটা আকাশ ছড়িয়ে থাকে আমার বুকে,
এতটা জ্যোৎস্না ফুল হয়ে ফোটে চারদিকে;
চাঁদ কীভাবে আলো জ্বেলে ঘুমোয় আমার সাথে তুমি তার কিছুই জানো না।
তোমাকে ভালোবেসেছি বলেই এমন বাতাসের মতো চলা,
ওড়নায় উড়িয়ে আনা মুখ কী গভীরভাবে দেখা!
একটা নদী জীবন বয়ে বয়ে কাটিয়ে দেওয়া।
কিছু মেঘপুঞ্জকে হাওয়ার ডানায় ভাসিয়ে আনা,
এই যে চুড়ির মতো চঞ্চল জীবন;
চোখে চোখে রাখা,
কেমন করে তা রচনা করে ভালোবাসার সাঁকো?
তোমাকে ভালোবেসেছি বলেই এমন পাহাড় হয়ে বাঁচা,
এই যে সবুজ অরণ্য,
যার ঢাল বেয়ে নামে কুয়াশার মেয়েরা;
সেখানে তুমি নেই,
এই যে অনন্ত উচ্চতায় নিঃশব্দে যে বাতাস বয়ে চলে;
যে নূপুর বেজে যায়,
রঙিন ঘাঘরায় যে সাঁওতালি ঢেউ ওঠে তার চুমকিতে যে আলোর রোশনাই;
সেখানে তুমি নেই,
তোমাকে ভালোবাসি বলেই আকাশ সমান শূন্যতা নিয়ে থাকা।

ঝিনুক ও নাবিকজীবন

এই ঘাটলার জল আর কেয়ার বাগান জানে,
মুনিয়া পাখির ডানায় লুকানো ভোর কতটা সতেজ ছিল।
এখানকার জলবিন্দু শাদা খামে ভরে যে ঢেউ এনেছিল এই বালুমেখলায়;
তাতে জীবনের ঝিনুক ছিল।
ভাসানো কড়ির পেটে রোদ এনেছিল লবণের ঘ্রাণ,
তোমার নাভিতে বিছানো আতর সে নোনা ঘ্রাণকে করেছিল কাঠগোলাপ।
ভিনদেশি নাবিক বিহ্বল চোখে তোমায় দেখে বলেছিল,
'একবার তোমার মধ্যমা ছুঁতে দেবে?
বুকের ভেতর রাখতে দেবে শঙ্খ?
ডুবোচরে বাঁধতে দিয়ো ঘর।'

আবাহন

শিউলি ফোটার দিন আসবে বলে যারা অলস অপেক্ষায় ছিল;
এবারের শরৎ তাদের নিরাশ করেনি।
নাকফুলের মতো শিউলি ভোরের লজ্জাবনত কুয়াশায় ঝরে ঝরে ঠিকই ঘাসের হৃদয়ে মুখ লুকিয়েছে।
গঙ্গাপূজার নৈবেদ্য ভাসিয়ে এনেছে ঘোলা জলে,
জলার্দ্র রোদে মাছের কানকোয় জমা জল যখন রূপোর মতো চিকচিক করে ওঠে;
তখন আড়মোড়া দিয়ে ভাঙে অন্নপূর্ণার ঘুম।
হলুদ আলোয় ভেসেছে পাড়া-মহল্লার ঘিঞ্জি গলি, পালপাড়া বধূদের মুখ,
রামগোলামের উঠোন।
হিরণ ঢাকীর বাবরি চুলে ধুনুচি নাচের মুদ্রা উৎকণ্ঠিত প্রেমিকার বুকে চিড় ধরায়।
সুজাতা দাস মানত করে, তার মাতাল স্বামী এবার সংসারী হবে।
হেঁশেল ঠেলে ঠেলে যার দিন যায়, কূট গন্ধ যার শরীরে লেপটে থাকে;
জবজবে ঘামে ভেজা শাড়ি আর স্থূল দেহ নিয়ে সেও দাঁড়ায় মায়ের সামনে।
নীল মেঘে নতুন দিন পালকের মতন উড়ে আসে।
বাতাস ডাকপিয়ন হয়ে সে পালককে চিঠি করে প্রেমিকার হাতে পৌঁছে দেয়।

আমি মন্দ যদি

আমারে সুতা কাটা ঘুড়ির মতন ছাড়বাই যদি তবে এখন ফিইরা পাবার জন্য এত
আকুলি-বিকুলি ক্যান তোমার মনে?
আমি তো তোমার কাছেই আমার মন রাইখ্যা গেছি এমন দাসখত কোথাও লিখি নাই।
এক একটা মায়াময় বিহান যায়, আমার আদরে লেপটে থাকা ঘুমের ভেতরে
তোমার প্রত্যাখান;
কেবলই পুলিশের আসামি ধরার বাঁশির মতন সাইরেন বাজায়।
একটা গোলাপ বাগান নষ্ট কইরবার কষ্টে তুমি কান্দো!
একটা মন গলা টিপে হত্যা কইরবার কষ্ট তুমি পোহাও না।
আমি যদি এতই খারাপ তো ছিনাই রাখছিলা ক্যান খোঁপা?
অঢেল জ্যোৎস্নায় দশ আঙুল ক্যান কইছিল কথা দশ আঙুলের লগে?
আমার মনের ভেতর বান দিয়া অন্যের গাঙে ভেজাও গতর।
ভালোবাসার হাজারটা চিঠি চাইলেই আমি দেখাইতে পারি।
কলঙ্কের টিপ আমি তো একলা পরি নাই,
সাধের বাসর ভাঙছ তুমি, উকিল পাঠাইয়া আমি তো তার জবাব চাই নাই।
ভালোবাসা দিবা না ভালো,
ছলনা ক্যান করো?
উড়াল দিয়া পক্ষী তুমি, আমারে ক্যান মাটির নীড়ে বাইনতে কইছ ঘর?

রহস্যপাঠ

অ, আ, ক, খ-এর মতো তোমার চিবুকের তিলটা যখন পড়তে শিখেছি,
তখন ভালোবাসার শিশুপাঠ শ্রেণিতে কেবল আমার আসা-যাওয়া।
বেশর কী? ওই বয়সে আমার তা জানার কথা নয়।
কিন্তু তোমার নাকের অর্ধচন্দ্রাকৃতির ওই অলংকারটুকুতে আমার সবটা আবেগ বড়শির মতো আটকে থাকতো।
তখন ভালোবাসার পাঠে আমার একশতে শূন্য পাওয়ার বয়স,
অলক কী? ওই বয়সে আমার তা বোঝার কথা নয়;
বিশ্বাস করো ওই গ্রীবাদেশে পতিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে আমার সমস্ত আদর মেখে থাকত।
বেহায়া চোখ তাতে বুলিয়ে দিত হাতের পরশ,
যখন আমি তেত্রিশ পেতে শুরু করেছি সবে;
তখন তোমার কবোষ্ণ কাঁচুলির পাঠ আমাকে তেত্রিশ থেকে শূন্যের সীমায় দাঁড় করিয়েছে।
তোমার ঈষৎ উষ্ণ বক্ষবন্ধনী আমাকে দিয়েছে জরদ যৌবন।
'হিঙ্গুলের টিপ' কী? তা তো পরিণত বয়সের পাঠ।
লাল রং হিসেবে ব্যবহৃত গন্ধক তোমার কপালে ভোরের রক্তিম সূর্যের মতো ছড়াত বিভা।
আমি তখন দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখেছি;
তখনও আমি তোমার কাঁধটাই ছুঁতে চেয়েছি।

প্রেমের মোহর

সুগন্ধা নদী সাঁতরে প্রেমের মোহর খুঁজেছি যেদিন;
সেদিন জেনেছিলাম ফুলতোলা নীল রুমাল পাব একদিন।
ঘুমঘোরে আবছা চাঁদ বেশর হয়ে আবছায়া মুখে দেখা দিত,
কুয়োভরতি জোছনা বালতি করে তুলে মধ্যরাতে গায়ে ঢেলেছি কত;
সানাইয়ের সুরের মতন একটা মিহি হাসির শব্দ খসখসে আঁচল হয়ে উড়ছে লিলুয়া বাতাসে।
মেঘের এক একটা আড়ে যেখানে চুল শুকোয় মেঘপরিরা—
তার থেকেও অনেক দূরের ধোঁয়া ওঠা মেঘের ভাঁজে খুঁজেছি প্রেমের মোহর।
কাঞ্চনগড় তল্লাটে ঢোল পিটিয়ে মোহরের সংবাদ জানাতে চেয়েছে যে রাজকুমার;
সেও জানে না মন দিয়ে কেনা প্রেম মোহরের বিনিময়ে বেচে না,
বুকের জরি বসানো কাপড়ে হয় না ফুল তোলা নীল রুমাল।

জলরঙে জীবনের আঁক

এই দোআঁশ মাটি, পল্লবিত আকাশমনির ডাল;
বালুবেলার চাপাখিরা জানে না কোন চাঁদকে দেখে দেখে আমার চন্দ্রমুখী রাত কাটে।
টানা বারান্দায় যে রোদ দুপুরকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আনে;
সুগন্ধি চন্দন গাছের ওপর সে দুপুর আড়াআড়ি বিছায় তার শরীর।
ঘুমভাঙা বিকেল আড়ষ্ঠতা ভেঙে কবিতার উপযোগী হয়ে ওঠে,
দুধের সরের মতন ঘন কুয়াশা আর কোনো কোনো বেগানা শীতকাতুরে রাত জেনে;
থাকতে পারে আমার একলা জীবনে সন্ধ্যামালতী ফুলের গল্প।
জীবনের নিত্য হালচালে এসেছে কি মেঘবাড়ির চিঠি?
ভাঙা খাট গলে যে রূপকথা নেমে এসেছিল;
হইচইয়ের দুনিয়ায় তাকে আর হ্যাঙারে ঝুলিয়ে জাদুঘরে রাখা হয়নি।
এই হেঁশেলি মন, খুচরো পয়সা আর শাদা-কালো দিন জানে না,
কতটা লালা ক্ষরে ক্ষরে ভেজে তেতো জীবনের পার।

টিপ

একটা টিপের কী ক্ষমতা তুমি তা জানো না,
তুমি যা বেখেয়ালে পরো, আমি তাই খেয়াল করে দেখি।
তুমি মুগ্ধ হও চন্দ্রগ্রহণ দেখে,
আর তোমার কপালজুড়ে যে টিপ চাঁদের মতন ভেসে থাকে তা দেখে মুগ্ধ হই আমি।
দিনের বেলাতেও আমার মনে গ্রহণ লাগে,
তোমার সিঁথির সীমান্তে যে এলোচুল বন্য ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে অহর্নিশ;
তোমার টিপের তটরেখায় এসে তা স্থির হয়।
কী বিপুল শক্তিতে তা বেণীআসহকলার মতন বর্ণবিভায় বিচ্ছুরিত হতে হতে আমার চোখের সীমানাকে করে তোলে দিগন্ত প্রসারিত।
তোমার ভ্রুর কেন্দ্রবিন্দুতে প্রণয়ের অনামিকা হয়ে উদ্ভাসিত হয় যে টিপ;
তার স্পর্শ আমাকে গৃহী হবার স্বপ্নে বিভোর করে তোলে।
এক একটা তারারা কী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে, তোমার কপালের টিপ হতে চায় তা যদি জানতে;
তুমি হতবাক হয়ে পড়তে তাদের মনের কথায়।
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সিঁদুরের লাল আবির সিঁথিতে জড়ানোর চেয়ে তুমি টিপ পরায় যত্নবান হতে।

তোমার প্রস্থান

তোমার চলে যাওয়া মানে এই ভিটেয় নামবে আবার দুপুরের শূন্যতা;
বাঁশবাগানে একলা ঘুঘু ডাকবে,
হাঁসের ছানাগুলোর বাড়ি না ফেরার কথা আর কেউ উৎকণ্ঠা ভরে জানতে চাইবে না।
সারি সারি সুপারির গাছ দাঁড়িয়ে থাকবে শোকার্ত সন্তানের মতো;
সুনসান পুকুর ঘাটে নীল আঁচল ভাসবে না আর শ্যাওলা জলে।
এক পায়ে হাঁটা মেহগনির বাগানের ভেতর দিয়ে যে পথ চলে গেছে মরা ব্রহ্মপুত্রের দিকে,
সে পথের দিকে নথ নাড়িয়ে আর কেউ করবে না চাতকের মতো অপেক্ষা।
মুড়ি ভানার ধান রোদে শুকোতে দিয়ে শালিক তাড়াবে কে?
তোমার প্রস্থান মানে, আয়না-চিরুনিতে ধুলো জমা,
ধানের গোলা শূন্য হওয়া,
আলতার কৌটো ঘরের দাওয়ায় খালি পড়ে থাকা।
আমি জানি উঠোনের আড়ে লাল শাড়ি আর উড়বে না লিলুয়া বাতাসে;
কাজল আর উঠবে না চোখে,
এলোমেলো চুড়ির বোলে ভাঙবে না ঘুম।
শিকেয় ঝুলানো আচারের বয়াম আর কেউ রোদে দেবে না;
গামছা দিয়ে চুলের জল ঝাড়তে গিয়ে দেহটাকে কেউ বেতলতার মতো বাঁকাবে না,
গোয়ালের গরুগুলো এতিম হবে;
পায়রারা হারাবে তাদের প্রেয়সীকে।
বাকবাকুম শব্দে শোনাবে না তাদের মনে জমে ওঠা গজল।
তোমার এই স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাঁঠাল বাগান হারাবে তার দুপুরের সই,
হাটবারে উঠোনের আড়ে পাট রোদে দেবে না কেউ;
গোপনে তাবিজে ফুঁ দিয়ে বলবে না কেউ, 'খোদা তুমি তারে রক্ষা কইরো।'
এক হাঁটু জল ভেঙে নাইওর যাওয়ার জন্য কেঁদেকেটে চোখ ফোলাবে না কেউ;
রাতভর ভাপা পিঠা বানিয়ে সকালে বলবে না কেউ, 'আমার মাথার দিব্যি রইল না খেয়ে তুমি যাবে না হাটে।'
মুড়ি-মুড়কি পড়বে না পাতে;
গা পোড়া জ্বরে কেউ দেবে না জলপট্টি।
তোমার প্রস্থান মানেই একটা লাল বেনারসির গল্পের সমাপ্তি।
পহেলা কার্তিকের রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার নামা।

দ্বিধা

একটা আলিঙ্গন, অতঃপর তুমি দ্বিধা নিয়ে বলেছো ফিরে যেতে।
তোমার চোখে তখন প্রেম মহুয়ার মতো নেশা জাগানিয়া।
তবুও ঘরময় তোমার ওড়না খসে পড়ার নিস্তব্ধতা।
আমি বুঝেছিলাম তুমি ভাববার সময় চাইছো,
তোমার ঝুমকোয় বিকেলের রোদ ছিল;
বুকের গম্বুজে সন্ধ্যার ছায়া তখনো নামেনি।
একবার বাহুডোরে বেঁধে তারপর বলেছো, 'আর আমাকে জড়িয়ে ধরো না ওভাবে।'
আমি বুঝেছি তুমি প্রস্তুত নও, প্রেম দিতে কিংবা প্রেম নিতে।
ভেবেছি তোমার মনে দ্বিধা চলছে,
প্রেম ও পুরুষের পাঠ তুমি ভালোভাবে বুঝতে চাইছো।
তোমার চুলে নাক ডুবিয়ে গন্ধ নেবার ক্ষণে বা মনোযোগ দিয়ে নূপুর পরিয়ে দেবার মুহূর্তে তুমি বলেছো, 'এসব তোমার অসহ্য লাগে।'
আমি বুঝেছি বেশি ভালোবাসা তুমি নিতে অপারগ।
তুমি এলোমেলো হও বলে তোমার টিপ কপালের মাঝ বরাবর না থাকলেও তা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ঠিক করি না।
তুমি পার ভাঙার মতো ভাঙো বলে তোমার শাড়ির কুচি গুছিয়ে দিই না।
অথচ আমি জানি তুমি দ্বিধাভরে এইসবই পেতে চাও।
তোমার চোখের নড়াচড়ায় আমি বুঝেছিলাম,
তোমার মনের কথা কার্নিশের বাতাসে কানপাতা পুরুষটাকে-ই তুমি জানাতে চাও।

তুমি বলেছিলে বলেই

তুমি বলেছিলে বলেই জোনাকি পোকার মন পড়তে বসা;
পদার্থবিজ্ঞানের আমি তোমার জন্যই হয়ে উঠি রবীন্দ্রনাথ।
একটা শিশিরে কী এমন থাকে যে, তোমার চোখ বুঝতে তাকেও অবলীলায় পাঠ করতে হয় আমায়?
তুমি বলেছিলে বলে হাড়িয়া নদীকে নতুন করে দেখা,
পাহাড়ের শরীর ভিজে ভিজে যে জল মেঘ গলিয়ে নদী হলো;
তোমাকে বুঝতে আজ তার ঢেউকে মুখস্থ করা।
তোমার মনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, যা বেণীর বুননে লুকানো—
তাকে জানার জন্য শেফালিকা বোসকে খুঁজেছি কত;
কার্জন হলের পথ শেষ হয়েছে কলা ভবনে,
ল্যাবরেটরি ছেড়ে কৃষ্ণচূড়া রোদে হেঁটেছি ভর দুপুর।
তুমি চেয়েছ বলেই বুনো শালিকের ভাষায় কথা বলা;
একশ আটটি নীল পদ্মের কবিকে চেনা।
যে 'দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছিল লাল কাপড়।'
তুমি বলেছ বলেই, 'রাত ভরে বৃষ্টি' পড়া,
নিঃসঙ্গ চাঁদকে সঙ্গ দেওয়া;
ভালোবাসা বাঁচে না, তাকে বাঁচাতে হয় নিবিড় আলিঙ্গনে—তোমার কাছ থেকে এ মন্ত্র শিখে নেওয়া।

জলে বন্দি প্রেম

হাওরের ডাহুক জানে না,
তোমার আমার প্রেমে নিন্দে হয় কেন?
জানে না ক্যামন করে নীল জলে ভাসে নীল শাড়ি,
কালার পিরীতির কথাও তার অজানা।
জানে শুধু সমাজ।
যে নাম লেখা আছে জলের গায়,
তা সহজে মোছা যায়?
আমি তো এঁকেছি সে নাম বিরল অনুভবে।
জলের শামুক জানে না,
কতটা আঘাত সয়ে সয়ে তোমাকে ভেতরে রেখেছি পুষে।
খোলসের আবরণ শক্ত করে তোমাকে বাঁচিয়েছি তিলে তিলে;
কতটা হেঁটে হেঁটে তোমাকে বয়ে এনে দিয়েছি তীরের রোদ।
জানে শুধু নিন্দুকেরা,
জলের মাছ জানে না;
তোমাকে ভালোবাসলে তাকে ডাঙায় তোলার মতো আমারও কষ্ট হয়।
কতটা সাঁতরে পার হতে হয় বিস্তীর্ণ জলাঞ্চল;
কতটা নিঃশ্বাস জমিয়ে রাখতে হয় বুক পাঁজরে।
তোমাকে নিয়ে কতটা ভাসতে হয় ডুব সাগরে,
জানে শুধু নিঠুরিয়া জেলে,
শিকারে যার অনন্ত আনন্দ।
সে কী করে বুঝবে তোমাতে ভাসতে পারার মগ্নতা?

পুরুষ পতঙ্গ

তোমার ঘুঙুর শোনে না আমার কথা,
আমি যে কথা কতকাল হলো চিঠিবন্দি করে রেখেছি;
নিঃশ্বাসের মতো জমিয়ে রেখেছি যে শব্দ উৎকণ্ঠা ভরে রোদ দিনের জন্য,
আকাশচূড়োয় ছড়ানো-ছিটানো রোদেরা তোমার সম্ভ্রম নিয়ে ভাবে।
কালবেলা দরজায় দাঁড়ানো;
ভালোবাসার নামে ছলনা নিয়ে এসেছে যে ঢেউ,
তা তোমার ওড়নাকে ভাসিয়েছে ঢের।
চাঁপার মতো দেহ ডুবেছে কলঙ্কের জলে;
কালপুরুষের থাবায় বিনষ্ট হয় খোঁপার চুল, বৃষ্টিবিলাস, কুচির ভাঁজ।
তোমার ভাষাময় চোখে নিষ্প্রভ দিনের গল্প করুণা করে উদগ্র কামনার বিষকে।
তোমার বিভোর ইচ্ছেরা শোনে না বারণ,
পুরুষ পতঙ্গ হয়ে উড়ে উড়ে ঘনিষ্ঠ হতে চায় তোমাতে।
তোমার ইচ্ছের নদীটাকে শুষে নিয়ে করে জলশূন্য বালুচর।
তোমার মনের নাব্যতা কমে সেখানে জড়ো হয় তেতো স্বাদ;
তখন সহজে অনুধ্যান করো আমার চিঠিবন্দি শব্দ।

তারপরে তুমি যেয়ো

আমি যখনই আকাশ ছুঁতে চেয়েছি কিংবা সমুদ্রের নীল জলে ভাসব বলে মনস্থির করেছি;
তুমি তখনই সামনে এসে দাঁড়িয়েছ,
খসে পড়া আঁচলের দোহাই দিয়ে বলেছ,
'এ যাত্রায় না গেলে হয় না;
দেখো আমার বাম চোখটা কেমন পিটপিট করে কাঁপছে কদিন ধরে।
সন্ধে হলে শরীরে কাঁটা দিয়ে গা ছমছম করে।
তুমি আর কটা দিন পরে যেয়ো,
উঠোনে পারুল ফুটবে ফুটবে করছে;
কুঁড়িটা ফোটা অবধি থেকে যাও।
তোমার আবদারের কাছে নত হয় আমার ইচ্ছে।
অতঃপর সময় যখন ঘনিয়ে আসে,
আবার চিম্বুক পাহাড়ের ঢাল আমায় যখন ডাকে;
লাবুব্ধা নদীর পার যখন পাঠায় আমন্ত্রণ;
তখন তুমি তোমার খোঁপার চুল বিছিয়ে দিয়ে বলো,
'এ চুলে বিনুনি কাটার ক্ষণ,
তাতে নিঙড়ে পড়া ভালোবাসার জল
সুগন্ধি তেলের ঘ্রাণ;
তুমি কি ভুলেছ সব?
তবে যাও এ 'ভালোবাসার জায়নামাজ' ডিঙিয়ে।
আরও কিছুক্ষণ রুখো,
বিষমাখা ছুরিতে কাটো কেন হৃদয়?
এই যে চাঁদ উঠি উঠি করছে;
ঝুরঝুর জ্যোৎস্নায় ভাসছে আড়িয়াল খাঁ।
এই মোহমুগ্ধ বেলায় তুমি কেমন করে পারো এত নিষ্ঠুর হতে?'
আমি আবার তোমার চাওয়ার কাছে নতজানু হই।
দিন গড়িয়ে যখন সময় ফুরোয়,
বিষণ্ন আকাশ তখন তোমার চোখে নামে,
নীল টিপের অপেক্ষা বাড়ে;
তোমার সিঁথির সিঁদুরে আমার হাত রাখো,
আলো নেভা চোখে বলো,
'আমার মরণ আসুক তারপরে তুমি যেয়ো।

গাছমানুষের কাব্য

এইসব বাকল ছাড়ানো গাছগুলো বুটের তলার অন্ধকারে বিবেকি মানুষের মতন
হয়ে ওঠে আজকাল।
বিদ্যুৎ বিল অথবা যেকোনো পরিসেবার মূল্য বাড়লে এরা হরতালের মতো
জনস্রোত তৈরি করে।
গাছগুলোর ছাল ছাড়ানো হয়েছিল যেন তারা আর কোনো দিন প্রতিবাদী মানুষ না
হয়ে ওঠে;
তারা শুধু ছায়া দেবে আর ভুঁইফোঁড় মানুষেরা তাতে পাবে আশ্রয়।
তাদের নির্বাক করা হয়েছে,
যেমন নির্বাক করা হয়েছে তাদের গা ঘেঁষে চলে যাওয়া পিচঢালা রাস্তা।
দাদনের টাকা উলুখাগড়া হয়ে বাড়ে কেবল;
দারুণ আঠাল পিচে সে ঋণ বড়শি হয়ে আটকে যায়।
একদিন পরগাছারা বিবেকি গাছ মানুষকে গ্রাস করে বটপাতা হবার ভান করে।
কাকের চোখের জলের মতো সে ভান দৃষ্টিকটু দেখায়;
তবুও বিবেকি গাছ মানুষেরা বটপাতার ওপর রোদ হয়, ছায়া দেয়; হয় শিশিরের জল।

নাগরিক মন

নাগরিক দুপুরে আজকাল বাড়ির পেছনের বেলি ফুল গাছটার কথা মনে পড়ে।
এই শহরে ভাসমান মানুষেরা যার গন্ধ পায়নি কোনো দিন;
সারি সারি জোনাকির আলো,
আমের বোলের সঙ্গে মৌমাছির প্রগাঢ় চম্বুনও তারা দেখেনি কখনো।
এই যে গাড়ির কাচ নামিয়ে আকাশ দেখা,
শাদার ভেতরে নীল রং খোঁজা;
জ্যোৎস্না দেখার বিলাসিতা করা।
রাত একটু কাজলের মতো গাঢ় হলে কলকল ঢেউ তুলে ছতনাই নদী আসে বারান্দায়।
সাথে করে নিয়ে আসে জলপোরা নীল মেঘ।
এই যে বড় চাকরি, মাকড়সার মতো ছড়ানো সংসার;
মোষের মতো ভারবাহী ফ্ল্যাটবন্দি জীবনে,
বুনো বৃষ্টি ফোটায় না জাম্বুরার ফুল।
পলেস্তারা খসে পড়া বাড়িটাই প্রচুর আলো ছিল, হাওয়ার আনাগোনা ছিল।
খুব সকালে ছিল খই আর কাঁসার বাটিভরতি দুধের ব্যবস্থা।
পুকুরের জলের ঠাণ্ডা আমেজ এখনও ঘুমের ভেতর মনে করিয়ে দেয় ডুবসাঁতারের দিন।
জানালায় এখন নামে না একলা চড়ুই,
এখন একটা মন অনেক দিন ধরে একটা নিঃসঙ্গ দুপুর পুষে রাখে;
নগর জানে কি? নাগরিক মনের তা জানার কথা নয়।

বিন্দু থেকে বৃত্তে

অন্ধকার ফুরিয়ে এলে জরির মতো চিকচিকে যে আলো আসে,
সেখানে ঝিনুকজীবন করে ঢেউয়ের অপেক্ষা;
পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপ্রজন্ম যে ইতিহাস লালন করে শোণিতের ভেতরে শরাবের সুগন্ধে তা কি উবে যায়?
কিংবা মুছে যায় কি প্রেমের উপাখ্যান, জাম ফুলের গন্ধ?
শব্দের পর শব্দরা আসে বাতাসে ভেসে;
রোদের পর রোদ,
এই যে বালিয়াড়ি যা একদা ফেনায়িত ঢেউকে দিয়েছে গাঢ় আলিঙ্গন;
তাকেও একদিন হতে হয়েছে ঝুরঝুরে বালুকণা।
কাঁকড়া, শামুকেরা খুঁজে নিয়েছে তার বুকে আশ্রয়।
তবুও সে প্রতিটি দিনে-রাতে ঢেউয়ের সাথে তার আলিঙ্গনের চিহ্নকে বুকে পুষে পুষে রাখে।
যেভাবে রাতের বেদনাকে চোখে ধরে রাখে রাতপিয়াসিনী;
এই যে ঘুঙুরের শব্দ, মেহেদির রং, সুরমার প্রলেপ, আতরের সুবাস;
দোলনচাঁপায় শোভিত খোঁপা,
আনত চিবুকে ঝুমকোর ছায়া;
চন্দ্রালোকিত কণ্ঠাহারে বিদ্যুৎচ্ছটা—সব আয়োজন নিভে যায় প্রিয় না আসার খবরে।
অলস দিন শূন্য কলসির মতো পড়ে থাকে,
মন মন্দিরে হাওয়া আসে, আলো ছড়িয়ে পড়ে, ঘণ্টা বাজে তবুও আরতি জমে না।
ধূপ, ধুনোর গন্ধ আসে, কীর্তিনাশা তেমনি বয়;
থেকে থেকে ঘূর্ণি জলের ভেতর বসতভিটে ধসে পড়ার শব্দ,
স্মৃতি থেকে এক একটা জাল ছিঁড়ে যায়।
নকশিকাঁটা উঠোন, দরদালান, চাঁপাফুলের গাছের ওপর কেমন ধুলো পড়ে।
পরিপাটি করে আঁকা ছবিটা জলে ভাসে;
কলকল স্রোতে ভাসে পারুলের দেহ, জবাফুল, মেঘকালো কেশ;
ভাসে একটা বিন্দু থেকে বৃত্তের ইতিহাস।

তোমাকে না দেখার অসুখ

তোমাকে দেখি না বলেই তোমাকে দেখার এই সাধনা,
পল পল করে জমিয়ে রাখা মুহূর্তেরা জানে আমার হার্টবিট কতটা নাজুক;
জানে নিদ্রাহীন চোখের পাতারা,
কতটা না দেখার তৃষ্ণা বয়ে বেড়ায় আমার দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বুক।
তোমার চুলের ঘ্রাণ স্মৃতির দুয়ার খুলে দেয়,
কত পথ পেরোবার ক্লান্তি দূর করে তোমার ঘামে ভেজা মুখ।
বুকে পাখির মতো খড়কুটো জমিয়ে কার জন্য বাঁধো ঘর?
আমি কি তোমারে ভালোবাসার সামিয়ানা টাঙিয়ে আগলে রাখিনি সারাক্ষণ?
আমার চোখ যা দেখে, মন তার থেকেও বেশি চাই তোমাকে।
দেখব না বলে বলে মন তোমারই ধ্যান করে সারা দিনমান।
সারাক্ষণ কানের ভেতর তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি,
নূপুরের বোল বাজে বুকের ভেতর চব্বিশ ঘণ্টা।
জানি তোমার চোখ উৎকণ্ঠিত নয় আমার জন্য,
তবুও তোমার বুকেই আমার ফেরার এত তাড়া।
অথচ এও জানি আমার পঁচিশ বছরের জমানো অনুভূতির জন্য;
তোমার বুকে সমুদ্রের মতো ঢেউ জাগবে না কোনোদিন।
এই যে তোমাকে না দেখার অসুখ,
এই যে তোমাকে ছোঁয়ার তৃষ্ণা;
এই যে তোমাকে হারাবার ব্যথা,
কত জনম ধরে বোবার মতো বয়ে চলেছি বলো?
আমার ভাষাহীন চোখ, তোমার ভাষাময় চোখের কাছে এসে জেনেছে—
তোমাকে না পাওয়া অসুখের অন্য নাম ভালোবাসা।

সোমেশ্বরী জানে না

সোমেশ্বরী জানে না তার জলে সন্ধ্যায় যে নারী চুল ধোয়, রূপোর তাবিজের মতন তার গতর।
সে এখন ঘর করে ভিন এক পুরুষের, অথচ একদিন তারও বুকে বন্য প্রেম ছিল; তামাটে বর্ণের নিজস্ব এক পুরুষ ছিল।
দাঁড়িয়াবান্ধা খেলতে গিয়ে যে তাকে জাপটে ধরেছিল মাঠভর্তি লোকের সামনে।
কেমন ডাকাত ছিল সে মাটির ঘরে সিঁধ কেটে জরির কৌটো দিতে ঢুকেছিল এক রাতে।
সোমেশ্বরী সাক্ষী তার জলের নিচে দশ বছর আগে যে চুম্বন সে এঁকেছিল ঠোঁটে; তার নোনা স্বাদ এখনও সে পায় সোমেশ্বরীর জলে।
এমন বেপরোয়া পুরুষ সে আগে দেখে নাই,
খড়ের পালানের সাথে ঠেসে ধরে যে খোঁপায় কদম গুঁজে বলেছিল 'আমার প্রেমরে ভুললেও কদমের ঘ্রাণ তোর খোঁপায় থাকব।'
কতবার সে সোমেশ্বরীর জলে চুল ধোয় কিন্তু চুল থেকে সে কদমের ঘ্রাণ যায় না কখনো।
চাঁন-ভানুর যাত্রা দেখব বলে এক রাতে তাকে চুরি করে সে নাও ভাসাইছিল সোমেশ্বরীর জলে।
সোমেশ্বরী জানে না সেই পুরুষকে কতকাল আগে ছেড়েছে সে নারী,
জলে সব কিছু মোছে, কলঙ্কের কালি মোছে না ক্যান?